POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ
اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ
وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

'তুমি বল, তোমাদের বক্ষদেশে যাহা কিছু আছে উহা তোমরা প্রকাশ কর অথবা গোপন কর, আল্লাহ্ উহা জানেন, এবং তিনি জানেন যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে। এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

(আলে ইমরান, আয়াত: ৩০)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 8

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 21শে ফেব্রুয়ারী, 2019 15 জামাদি আল সানি 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

খোদা তা'লা স্বয়ং মুত্তাকীদের রক্ষক হয়ে যান এবং এমন ঘটনা থেকে তাদের রক্ষা করেন যা মানুষকে অসত্য বলতে বাধ্য করে। স্মরণ রেখো! যখন কেউ আল্লাহকে ত্যাগ করে, তখন আল্লাহও সেই ব্যক্তিকে ত্যাগ করেন। যখন রহমান খোদা কাউকে ত্যাগ করেন, তখন শয়তান অবশ্যই এমন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

তাকওয়ার আশিস

আমরা তাকওয়া ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে কতদূর উন্নতি সাধন করলাম সে বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এর জন্য সঠিক মানদণ্ড হল কুরআন। আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকিদের একটি বৈশিষ্ট্য এও বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে ইহজগতের অপ্রিয় বিষয়াদি থেকে মুক্ত করে নিজেই সেগুলির অভিভাবক হয়ে ওঠেন। যেরূপ তিনি বর্ণনা করেছেন-

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

অর্থাৎ এবং যে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে-তিনি তাহর জন্য কোন না কোন উদ্ধারের পথ করিয়া দিবেন। এবং তিনি তাহাকে এমন দিক হইতে রিযক দিবেন যাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। (সূরা তালাক, আয়াত: ৩,৪) ভিন্ন বাক্যে মুত্তাকিদের এটিও একটি বৈশিষ্ট্য যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অনৈতিক বিষয়সমূহ ও প্রয়োজনাদির মুখাপেক্ষী করেন না। যেমন- একজন দোকানদারের বিশ্বাস, ব্যবসার ক্ষেত্রে অনৈতিকতা ছাড়া গতি নেই। এই কারণে সে ঠকানোর কাজ থেকে বিরত হয় না আর মিথ্যা বলার অজুহাত তৈরী করে। কিন্তু একথা একেবারেই সঠিক নয়। খোদা তা'লা স্বয়ং মুত্তাকীদের রক্ষক হয়ে যান এবং এমন ঘটনা থেকে তাদের রক্ষা করেন যা মানুষকে অসত্য বলতে বাধ্য করে। স্মরণ রেখো! যখন কেউ আল্লাহকে ত্যাগ করে, তখন আল্লাহও সেই ব্যক্তিকে ত্যাগ করেন। যখন রহমান খোদা কাউকে ত্যাগ করেন, তখন শয়তান অবশ্যই এমন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে।

একথা মনে করো না যে, আল্লাহ্ তা'লা দুর্বল। তিনি অতীব শক্তিশালী। যখন তুমি কোন বিষয়ে তাঁর উপর নির্ভর করবে, তখন নিশ্চয় তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন। وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ (তালাক, আয়াত: ৪) কিন্তু এই আয়াতের পূর্বে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তারা হল ধর্মপরায়ণ মানুষ। তাদের যাবতীয় চিন্তাভাবনা কেবল ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়েই আবর্তিত হয়, আর পার্থিব বিষয়াদি খোদার হাতে সোপর্দ করে দেয়। এই কারণে খোদা তা'লা তাদেরকে এই বাণী দ্বারা আশ্বস্ত করেছেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। মোটকথা তাকওয়ার আশিসসমূহের মধ্যে একটি হল, আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকিদেরকে সেই সমস্ত বিপদাপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করেন যেগুলি ধর্মীয় পথে তাদের জন্য অন্তরায় হয়।

মুত্তাকিদের জন্য আধ্যাত্মিক বিধান

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকিদের জন্য বিশেষ বিধানের ব্যবস্থা করেন। এখন আমি আধ্যাত্মিকতা ও তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক বিধানের উপর আলোকপাত করব। আঁ হযরত (সা.) নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্বের সম্মুখীন হওয়া তাঁর জন্য অবধারিত ছিল, যাদের মধ্যে ছিল গ্রন্থধারী, দার্শনিক, উচ্চমেধা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ ও পণ্ডিতকুল। কিন্তু তাঁকে আধ্যাত্মিক খোরাকের এমন প্রাচুর্য্য দান করা হয়েছে যে, তিনি সকলের উপর জয়যুক্ত হয়েছেন এবং তাদের সকলের ভুল-ভ্রান্তি চিহ্নিত করেছেন।

এটি এমন এক আধ্যাত্মিক বিধান ছিল যার কোন তুলনা নেই। মুত্তাকিদের প্রশংসায় অন্যত্র এও বর্ণনা করা হয়েছে যে- اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗۤ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ (আনফাল: ৩৫) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বন্ধু তারাই যারা মুত্তাকি। অতএব সামান্য দুঃখ সহন করেই খোদার নৈকট্যভাজন নামে অভিহিতি হওয়া কত বড় আশীর্বাদ! বর্তমান যুগের মানুষ এমনই হতোদ্যম যে, যদি কোন প্রশাসনাকি কর্তা বা অফিসার কাউকে বন্ধু বলে সম্বোধন করে বা তাকে আসন দেয় বা কোন উপায়ে সম্মান দেয়, তবে তার গর্বের শেষ থাকে না, দম্ভ করে বেড়ায়। কিন্তু সেই ব্যক্তির কত মহান মর্যাদা যাকে আল্লাহ্ তা'লা বন্ধু বলে সম্বোধন করে! আল্লাহ্ তা'লা হযরত রসুলে করীম (সা.)-এর মুখ দিয়ে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেরূপ বুখারীর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে-

لَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهٗ، فَاِذَا اَحْبَبْتُهٗ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهٖ، وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهٖ، وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا، وَاِنْ سَاَلَنِيْ لَاُعْطِيَنَّهٗ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَاُعِيْذَنَّهٗ

(সহী বুখারী, চতুর্থভাগ, বাবুত তোয়াযু)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার বন্ধু নফল (ঐচ্ছিক ইবাদত)-এর মাধ্যমে এমন নৈকট্য অর্জন করে নেয়।

ফরয ও নফল (আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক)

মানুষ যা কিছু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে সেগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি ফরয বা আবশ্যিক এবং অপরটি হল নফল বা ঐচ্ছিক। ফরযের অর্থ হল যা কিছু মানুষের উপর বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন- ঋণ

এরপর শেষের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

৮ই ডিসেম্বর, ২০১৮
হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন- বর্তমান বিশ্বে সাধারণত ধর্মের প্রতি মানুষের খুব বেশি মনোযোগ নেই। তারা ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কেও জানতেও বেশি আগ্রহী নয়। সাধারণত মনে করা হয় যে, ধর্মীয় জগতে বা ধর্মের ইতিহাসে কেবল পুরুষদেরই গুরুত্ব রয়েছে, নারীদেরকে কোন মর্যাদা দেওয়া হয় না। এই বিষয়টি নিয়ে কিছু ইসলাম বিরোধী মানুষ বা বলা চলে ধর্মবিরোধী মানুষ বেশি করে সমালোচনা করে। বিশেষ করে ইসলামের উপর বারবার এই আপত্তি উত্থাপন করা করা হয় যে, মহিলাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর করে রাখা হয়েছে আর তাদের ভূমিকা বা ত্যাগস্বীকারকে পুরুষদের তুলনায় নিম্নতর পর্যায়ে রাখা হয়। পুরুষদের ভূমিকা ও কার্যকলাপ সর্বদা সমাদৃত হয়, পক্ষান্তরে মহিলাদের ভূমিকা ও কার্যকলাপকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কিন্তু আমরা যখন বিষয়টির গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখি যে, ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম কি ধর্মের উদ্দেশ্যে মহিলাদের সেবা, ধর্মের অগ্রগতিতে তাদের ভূমিকা ও ত্যাগস্বীকারকে পুরুষদের সেবা ও ভূমিকা থেকে খাটো করে দেখে বা ইসলামে এর মর্যাদা নিম্ন পর্যায়ের বা কম গুরুত্ব দেওয়া হয়? এর উত্তর নঙর্থক পাওয়া যাবে। আর প্রত্যেক জ্ঞানী মহিলা এ সম্পর্কে অবহিত আছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন- একজন মুসলমান ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং জ্ঞানগত সত্যতার জন্য যে বিষয়ের উপর ভরসা করে বা যার সাক্ষ্যের উপর বিশ্বাস রাখে বা সর্বান্তকরণে সত্য বলে বিশ্বাস করে সেটি হল কুরআন করীম। এতে বস্তুনিষ্ঠ ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে আর কুরআন করীম থেকে আমরা জানতে পারি যে, ধর্মীয় ইতিহাসে মহিলাদের উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। মহিলাদের প্রশংসনীয় কার্যসমূহের আল্লাহ্ স্বয়ং সাক্ষ্য দান করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। আর এই প্রশংনীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর কারণে মহিলাদেরকে সেই সব পুরস্কাররাজির অংশীদার করা হয়েছে যেগুলির জন্য পুরুষরা প্রতিদানের যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে বা প্রতিদানে ভূষিত হয়েছে।

কুরআন করীমের পর আঁ হযরত (সা.)-এর নির্দেশাবলী ও উক্তি মহিলাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও ভূমিকার উপর আলোকপাত করে। এছাড়া জামাতে আহমদীয়া মুসলেমায় ইসলাম ও আহমদীয়াতের ইতিহাস একথারও সাক্ষ্য বহন করে এবং এবিষয়ের উপর আলোকপাত করে যে, মহিলাদের ভূমিকা ও ত্যাগস্বীকারের গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা দেখি যে, যেভাবে পুরুষদের কুরবানী এবং ধর্মের উদ্দেশ্যে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে ধর্মের ইতিহাস এবং বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম সংরক্ষিত রেখেছে, সেখানে মহিলাদের কুরবানী এবং ভূমিকাকেও খাটো করে দেখা হয় নি, সেগুলিকে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। বরং যাচাই করলে দেখা যাবে যে, ইসলাম ধর্মের সূচনাই হয়েছে মহিলার কুরবানীর মাধ্যমে। যেরূপে প্রত্যেক মুসলমান অবগত আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের ভিত্তি রেখেছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে আর এই ভিত রচনায় মহিলার অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কুরআন করীমেও একথার উল্লেখ রয়েছে এবং হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইব্রাহিম (আ.) কে স্বপ্নে দেখান যে, তিনি নিজের একমাত্র পুত্রকে জবেহ করছেন। হযরত ইসমাইল তাঁর প্রথম এবং কয়েক বছর পর্যন্ত একমাত্র সন্তান ছিলেন। হযরত ইসহাক (আ.) কয়েক বছর পর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। যাইহোক হযরত ইসমাইল (আ.) -এর বয়স তখন মাত্র কয়েক বছর ছিল যখন হযরত ইব্রাহিম (আ.) এই স্বপ্ন দেখেন এবং তিনি তাঁকে শোনান। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে এভাবে দেখেছি যে তোমাকে জবেহ করছি। সেই যুগে মানুষ প্রতিমাদের সন্তুষ্ট করতে নরবলি দিত আর বিশেষ করে পুত্রসন্তানকে জবেহ করা অনেক বড় ত্যাগস্বীকার বলে বিবেচিত হত। এই কারণেই হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর মনে এই ভাবনার উদয় হয় যে, প্রতিমার উদ্দেশ্যে মানুষের আহুতি দেওয়ার প্রথা তো রয়েছেই। অতএব এই স্বপ্নের অর্থ হল আমাকেও প্রথানুসারে নিজের পুত্রকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বলি দিতে হবে আর এটিই আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায়। হযরত ইব্রাহিম (আ.) যখন হযরত হযরত ইসমাইল (আ.) এর সামনে একথার উল্লেখ করেন, যেভাবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তখন হযরত ইসমাইল (আ.) উত্তর দিলেন, আপনি নিজের স্বপ্ন পূর্ণ করুন। ইনশাআল্লাহ্ আমাকে ধৈর্য্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন। হযরত ইব্রাহিম (আ.) তাকে বাইরে জঙ্গলে নিয়ে যান এবং জবেহ করার জন্য উপুড় করে শুইয়ে দেন। তিনি জবেহ করতে উদ্যত, ঠিক সেই সময়ে, যেরূপ কুরআন করীমেও বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ইলহামের মাধ্যমে সংবাদ দেন- **'কাদ সাদ্দাকতার রুইয়া'**। অর্থাৎ তুমি যখন নিজ পুত্রকে জবেহ করার জন্য প্রস্তুত হলে, তখনই তুমি নিজের স্বপ্ন পূর্ণ করে দিয়েছো। তোমার এই কাজ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, তুমি নিজ পুত্রকে জবেহ করতে পার, কিন্তু এখন তুমি তাকে জবেহ করবে না। আজ থেকে ধর্মীয় ইতিহাসে আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা দিলেন যে, আজ থেকে নরবলির প্রথার অবসান হল আর এই প্রথা সঙ্গত নয়। বরং আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে কুরবানী করার নতুন প্রথার প্রবর্তন ঘটবে যা এই কুরবানী থেকে অনেক উচ্চমানের এবং চিরস্থায়ী হবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে পুনরায় ইলহাম করে বলেন, হযরত হাজেরা এবং তাঁর পুত্র ইসমাঈলকে মক্কা নামক স্থানে নিয়ে গিয়ে সেখানে ছেড়ে দাও। এই আদেশ অনুসারে হযরত ইব্রাহিম (আ.) হযরত ইসমাইল এবং হাজরাকে মক্কা নামক স্থানে নিয়ে যান। সেই যুগে সেখানে দূর দূরান্ত পর্যন্ত কোন জনবসতি ছিল না। তিনি সঙ্গে পানির একটি মশক এবং খেজুরের একটি থলে নিয়ে গিয়েছিলেন। মা ও সন্তানের কাছে সেই পানি ও খেজুর রেখে দিয়ে তাদেরকে সেখানেই রেখে দিয়ে ফিরে আসেন। এখান থেকে সেই স্থায়ী কুরবানীর ধারা আরম্ভ হয় যা আল্লাহ্ তা'লা একজন মানুষের প্রাণের আহুতির অবসান ঘটিয়ে সূচনা করেছিলেন। বস্তুত স্বপ্নে এই কুরবানীর কথাই উল্লেখ ছিল, ছুরিকা চালনা করার কথা বলা হয় নি। অর্থাৎ এমন স্থানে তাদের রেখে এস যেখানে না খাদ্য পাওয়া যায় না পানি পাওয়া যায়। এটি তোমার পক্ষ থেকে এক প্রকারের জবেহ করার তুল্য। যাইহোক ফিরে আসার সময় স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি ভালবাসার কারণে তিনি কয়েক পা অগ্রসর হয়ে পিছন ফিরে দেখেন এবং পুনরায় হাঁটতে শুরু করেন, পুনরায় থমকে যান এবং পিছনে ফিরে তাকান। কয়েকবার এভাবে পিছনে ফিরে তাকাতে হযরত হাজেরা, যিনি একজন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্না মহিলা ছিলেন, তিনি অনুধাবন করলেন যে, হযরত ইব্রাহিম আমাদেরকে এখানে ছেড়ে কোন সাধারণ কাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন না কিম্বা এদিক ওদিকে কোন স্থান খোঁজ করতে যাচ্ছেন না, বরং নিশ্চয় কোন রহস্য রয়েছে যা তিনি আমাদের নিকট গোপন করছেন। হযরত হাজেরা হযরত ইব্রাহিমের পিছনে পিছনে যান এবং বলেন, আপনি কি আমাদেরকে এখানে একা রেখে যাচ্ছেন? তিনি এর কোন উত্তর দিলেন না। হযরত হাজেরা কিছুদূর পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করে এই একই প্রশ্নই করতে থাকেন। কিন্তু হযরত ইব্রাহিম (আ.) কোন উত্তর দিলেন না। হযরত হাজেরা বুঝতে পারেন যে, আবেগ ও বেদনার আতিশয্যে তিনি কোন উত্তর দিচ্ছেন না। অবশেষে হযরত হাজেরা বলে উঠলেন- 'হে ইব্রাহিম! আপনি কার আদেশে আমাদেরকে এখানে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন? হযরত ইব্রাহিম (আ.) আবেগাপ্লুত হওয়ার কারণে মুখে তো কিছু বলতে পারলেন না, কিন্তু আকাশের দিকে হাত উঁচিয়ে ইঙ্গিত করলেন। তখন হাজেরা বললেন, আপনি যদি আমাদেরকে এখানে আল্লাহ্‌র আদেশে ত্যাগ করে যাচ্ছেন, তবে উদ্বেগের কোন বিষয় নেই। যদি খোদা তা'লা একথা বলেছেন, তবে তিনি আমাদেরকে বিনষ্ট করবেন না। একথা বলে তিনি ফিরে আসেন। এটি তাঁর ঈমানের মান ছিল। সেই সামান্য পরিমাণ খেজুর ও পানি কিছু দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। খাদ্য ও পানীয় শেষ হয়ে যেতে হযরত ইসমাইল যখনই পানি চাইতেন বা খেতে চাইতেন তিনি কিভাবে দিতে পারতেন? মাইলের পর মাইল দূরত্বেও কোন জনপদ ছিল না। আর কোন ব্যবস্থাও হওয়া সম্ভব ছিল না। অবশেষে হযরত ইসমাইল ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে জ্ঞান হারাতে থাকেন। জ্ঞান ফিরলে পুনরায় পানি চাইতেন আর পুনরায় অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। মা সন্তানের এই অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতেন আর অদূরেই সাফা ও মারওয়া নামে যে দুটি অনুচ্চ পাহাড় ছিল, সেখানে গিয়ে পানি কিম্বা কোন যাত্রীদলের সন্ধানে দৃষ্টি ক্লান্ত করে ফিরে আসতেন। প্রথমে সাফা পাহাড়ে গিয়ে দেখতেন সেখানে কিছুই চোখে পড়ছে না, তখন তিনি মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ে এসে চড়াই করতেন। দৌড়ে পাহাড় চড়ার একটি কারণ ছিল, দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে যে উঁচু স্থান ছিল, সেটি সামনে আসায় হযরত ইসমাঈল (আ.) দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেন। তাই উদ্বিগ্ন হয়ে উপরে চড়তেন যাতে সন্তানের উপরও দৃষ্টি থাকে। তিনি সাত বার পরিক্রমা করার পর ফিরিশতাদের পক্ষ থেকে আওয়াজ আসে-' হাজেরা সন্তানের কাছে যাও, আল্লাহ্ তা'লা তোমার সন্তানের জন্য পানির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি যখন সন্তানের কাছে এলেন, তখন দেখলেন শিশু যেখানে ছটপট করছিল সেখানে একটি পানির প্রস্রবণ বইতে শুরু করছে। এভাবে সেখানে পানির কারণে যাত্রীদল অবস্থান করতে আরম্ভ করে। এইভাবে মক্কার গোড়া পত্তন হয়। হযরত ইব্রাহিম (আ.) পুনরায় মক্কার ভিত রচনা করার সময় এই দোয়া

এরপর ৮পাতায়...

জুমআর খুতবা

“ইসলাম প্রসার লাভ করেছে নিজের সৌন্দর্যের গুণে, বাহুবলে নয়”

মদিনা হিজরতের সময় সওর গুহায় হযরত আবুবকর (রা.) হযরত নবী করীম (সা.) -এর সেবা এবং সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবী হযরত আমির বিন ফুহাইরা (রা.) পবিত্র জীবনালেখ্য সম্পর্কে আলোচনা।

বে’রে মওনার যন্ত্রনাদায়ক ঘটনায় তিনি শাহাদত বরণ করে ইসলামের ইতিহাসে চিরঅমর হয়েছেন।

আল্লাহ্ তা’লাদের এই সকল সাহাবাদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১৮ জানুয়ারী , ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (১৮সুলাহ, ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: আজ আমি হযরত আমের বিন ফুহায়রা (রা.) এর উল্লেখ করব। ইতিহাসে তাঁর সম্পর্কে দীর্ঘ বিবরণ পাওয়া যায়। ইসলামী ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা রয়েছে, যাতে তাঁর অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছে। আর সেসব ঘটনা এমন, যা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করাও আবশ্যক।

তাঁর ডাকনাম ছিল আবু আমর। আর আযদ গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তিনি হযরত আয়েশার সৎভাই তোফায়েল বিন আব্দুল্লাহ্ বিন সাখবারা-র ক্রীতদাস ছিলেন। তিনিও কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস ছিলেন। বৈপিতৃয় ভাইদের আখইয়াফি ভাই বলা হয়। তিনি প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভংক্ত ছিলেন অর্থাৎ শুরুতে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহনবী (সা.) দ্বারে আরকামে যাওয়ার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হযরত আবু বকর (রা.) এর ছাগপাল চরাতেন। ইসলাম গ্রহণের পর কাফেরদের পক্ষ থেকে তাঁকে অনেক কষ্ট দেওয়া হয়। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। মদীনায় হিজরতের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং হযরত আবু বকর যখন সওর গুহায় ছিলেন তখন তিনি হযরত আবু বকর এর ছাগপাল চরাতেন। হযরত আবু বকর তাঁকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, ছাগপাল আমাদের কাছে নিয়ে আসবে। অতএব তিনি সারাদিন ছাগপাল চরাতেন আর সন্ধ্যায় হযরত আবু বকরের ছাগপাল সওর গুহার কাছে নিয়ে যেতেন। তখন তারা উভয়ে, অর্থাৎ মহানবী (সা.) এবং আবু বকর নিজেরাই দুধ দোহন করতেন। যখন আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর তাদের উভয়ের কাছে অর্থাৎ মহানবী (সা.) এবং আবু বকর এর কাছে যেতেন, তখন হযরত আমের বিন ফুহায়রা তার পেছনে পেছনে যেতেন যেন তার পায়ের চিহ্ন মুছে যায় আর এটি বোঝা না যায় যে, হযরত আবু বকরের পুত্র কোথায় যাচ্ছে অর্থাৎ কাফেরদের যেন কোন প্রকার সন্দেহ না হয়। যখন মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর সওর গুহা থেকে বের হয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন হযরত আমের বিন ফুহায়রাও তাঁদের সাথে হিজরত করেন। হযরত আবু বকর তাঁকে বাহনে নিজের পেছনে বসিয়ে নিয়েছিলেন। তখন তাঁদের পথ প্রদর্শনকারী ছিল বনু আদী এর এক মুশরেক ব্যক্তি।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

মহানবী (সা.) হিজরতের পর হযরত আমের বিন ফুহায়রা এবং হযরত হারেস বিন অওস বিন মুআয এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। হযরত আমের বিন ফুহায়রা বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, আর বি’রে মঊনা-র ঘটনায় চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর শাহাদত লাভ হয়।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

হযরত আবু বকর হিজরতের পূর্বে সাতজন এমন দাসকে মুক্ত করিয়েছিলেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা’লার পথে কষ্ট দেওয়া হতো। তাঁদের মাঝে একজন ছিলেন হযরত বেলাল। হযরত আমের বিন ফুহায়রাও তাঁদের একজন ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৯ দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

হিজরতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একদিন আমরা ঠিক দুপুরবেলা হযরত আবু বকর (রা.) এর ঘরে বসেছিলাম। অর্থাৎ নিজেদের ঘরে বসেছিলেন। কোন এক ব্যক্তি হযরত আবু বকরকে বলে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের মাথা আবৃত করে আসছেন। তিনি (সা.) এমন সময়ে আসেন যখন তিনি আমাদের কাছে আসতেন না। যখন তিনি (সা.) পৌঁছন তখন হযরত আবু বকর বলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত। খোদার কসম, আপনার এমন আগমণ বলছে, অবশ্যই কোন বড় কাজ হয়ে আছে। হযরত আয়েশা বলেন, ততক্ষণে মহানবী (সা.) পৌঁছে যান এবং ভেতরে আসার অনুমতি চান। হযরত আবু বকর অনুমতি দিলে তিনি (সা.) ভেতরে আসেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকরকে বলেন, তোমার ঘরে যারা আছে তাদেরকে বাইরে পাঠিয়ে দাও। হযরত আবু বকর বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আমার এখানে তো কেবল আপনার ঘরের লোকেরাই রয়েছে, অর্থাৎ আয়েশা, উম্মে রুমান এবং তার মাতা। মহানবী (সা.) বলেন, আমি হিজরত করার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছি। হযরত আবু বকর বলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমাকেও নিজের সাথে নিয়ে চলুন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, তুমিও আমার সাথে চল। হযরত আবু বকর বলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, যেহেতু একসাথেই যেতে হবে তাই আমার বাহন হিসেবে ব্যবহারের এই দুটি উটনী থেকে একটি আপনি গ্রহণ করুন। মহানবী (সা.) বলেন, আমি মূল্যের বিনিময়ে নিব। হযরত আয়েশা বলতেন, অতএব আমরা অতি দ্রুত দুজনের পাথেয় প্রস্তুত করে দিলাম। আর আমরা তাদের জন্য পাথেয় তৈরি করে চামড়ার থলিতে রেখে দিই। হযরত আবু বকরের কন্যা হযরত আসমা নিজের কোমর-বন্ধনী থেকে একটি টুকরা কেটে তা দিয়ে সেই থলির মুখ বেঁধে দেন.। এ কারণে তার নাম হয়ে যায় ‘যাতুন নিতাক’।

তিনি বলতেন, এরপর মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর সওর পাহাড়ের এক গুহায় গিয়ে পৌঁছন এবং সেখানে তিন রাত পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর রাতে তাদের উভয়ের কাছে গিয়ে অবস্থান করতেন। তখন তিনি চতুর ও বিচক্ষণ যুবক ছিলেন,

অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। তিনি অন্ধকার থাকতেই তাদের কাছ থেকে চলে আসতেন। অর্থাৎ ভোরে অন্ধকার থাকতেই ফিরে আসতেন আর মক্কায় কুরাইশদের মাঝেই তার সকাল হতো। মনে হতো যেন সেখানেই রাত অতিবাহিত করেছেন। আর তাদের অর্থাৎ কাফেরদের যে পরিকল্পনার কথাই শুনতে পেতেন, তা তিনি ভালোভাবে আত্মস্থ করতেন আর অন্ধকার হওয়ার পর গুহায় পৌঁছে তাদেরকে তা অবহিত করতেন। অর্থাৎ তিনি সারাদিন মক্কায় অবস্থান করতেন আর কাফেররা যে ষড়যন্ত্রই করতো সে সম্পর্কে সন্ধ্যায় তাদেরকে অবহিত করতেন। হযরত আবু বকরের দাস আমের বিন ফুহায়রা ছাগপাল থেকে একটি দুগ্ধদানকারী ছাগল তাদের কাছে চরাতেন আর এশা-র কিছুটা পর সেই বকরি তাদের কাছে নিয়ে আসতেন এবং তারা উভয়ে টাটকা দুধ পান করে রাত অতিবাহিত করতেন। অর্থাৎ সেই দুধের ছাগলের দুধ তারা উভয়ে পান করতেন। আমের বিন ফুহায়রা রাতের প্রথম প্রহরে পশুপালে চলে যেতেন আর ছাগলগুলোকে হাঁকতে আরম্ভ করতেন। তিন রাত পর্যন্ত তিনি এমনই করতে থাকেন। মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর বনু দীল গোত্রের এক ব্যক্তিকে পথ দেখানোর জন্য পারিশ্রমিক দিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। সে বনু আবদ বিন আদী-এর সাথে সম্পর্ক রাখতো এবং খুবই অভিজ্ঞ ও পথ দেখানোর ক্ষেত্রে পারদর্শী ছিল। সেই ব্যক্তি আস বিন ওয়ায়েল এর বংশের সাথে সন্ধির চেষ্টা করেছিল, আর কাফের কুরাইশদেরই ধর্মনীতির অনুসারী ছিল। মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর উভয়ে তার ওপর বিশ্বাস করেন। যদিও সে কাফের ছিল আর কুরাইশদের হাতে লালিতপালিত ছিল, কিন্তু যাহোক তিনি (সা.) তাকে বিশ্বাস করেন আর নিজ বাহনের উটনীগুলো তার হাতে তুলে দেন এবং তার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নেন যে, সে তিন দিন পর প্রভাতে তাদের উষ্ট্রীগুলো নিয়ে সওর গুহায় পৌঁছবে। আমের বিন ফুহায়রা এবং সেই পথনির্দেশক তাদের উভয়ের সফরসঙ্গী হয়। সেই পথনির্দেশক তাদের তিনজনকে সমুদ্রের তীরবর্তী পথ দিয়ে নিয়ে যায়। এটি বুখারীর বর্ণনা।

(সহী বুখারী, কিতাব মানাকেবুল আনসার , হাদীস- ৩৯০৫)

সুরাকা বিন মালেক বিন জোশম বলতেন যে, কাফের কুরাইশদের দূত আমাদের কাছে আসে, আর যে ব্যক্তি মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকরকে হত্যা বা বন্দি করবে তার জন্য দিয়্যত বা রক্তপণ নির্ধারণ করতে শুরু করে। আমি যখন আমার স্বজাতি বনু মুদলেজ এর এক বৈঠকে বসে ছিলাম, তখনই তাদের এক ব্যক্তি সামনে থেকে আসে, সেখানে এসব কথা-ই হচ্ছিল যে, কীভাবে পাকড়াও করা যায় বা হত্যা করা যায় এবং মহানবী (সা.) ও হযরত আবু বকরের ওপর হামলা করা যায়। তিনি বলেন, আমাদের বৈঠকে এসব কথা-ই হচ্ছিল, এমন সময় এক ব্যক্তি আসে আর আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। আমরা বসে ছিলাম। সে বলা আরম্ভ করে যে, হে সুরাকা! আমি এখনই সমুদ্র উপকূলীয় পথে কিছু ছায়া দেখেছি। আর আমি মনে করি এরা-ই মুহাম্মদ (সা.) এবং তার সাথিরা। সুরাকা বলেন, আমি তখনই বুঝতে পারি যে, এরাই তারা, কিন্তু আমি তাকে বললাম, এরা আদৌ তারা নয়, বরং তুমি অমুক অমুককে দেখেছ যারা আমাদের সম্মুখ দিয়েই গিয়েছে। অর্থাৎ তার কথা প্রত্যাখ্যান করেন বা উড়িয়ে দেন। এরপর আমি সেই বৈঠকে কিছুক্ষণ অবস্থান করি। সুরাকার তখন এই লোভও ছিল যে, কোথাও সে আবার তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে পুরস্কারের দাবিদার না হয়ে যায়। তিনি বলেন, যাহোক আমি তার কথা প্রত্যাখ্যান করি। এর কিছুক্ষণ পর আমি উঠি এবং ঘরে যাই আর নিজের দাসীকে বলি যে, আমার ঘোড়া বের কর, আর তা যেন টিলার অপর প্রান্তেই থাকে। অর্থাৎ পিছনে ছোট একটি টিলা ছিল, আমার ঘোড়াকে সেখানে নিয়ে যাও এবং সেখানেই আমার জন্য বেঁধে রাখ। এরপর আমি আমার বর্শা নিই আর তা নিয়ে ঘরের পিছন দিক দিয়ে বের হই। আমি বর্শার ফলাকে মাটিতে রাখি অর্থাৎ সেটির উপরের অংশকে নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখি আর এভাবে আমার ঘোড়ার কাছে পৌঁছি এবং তাতে আরোহন করি। অর্থাৎ তিনি নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, ঘোড়ায় চড়ার জন্য বর্শার সাহায্য নেন এবং ঘোড়ায় চড়েন। আমি সেটিকে উদ্দীপ্ত করি, অর্থাৎ কিছুটা চাপড়ে দিই এবং সেটিকে ছুটাই আর সেটি আমাকে নিয়ে তড়িৎ গতিতে দৌড়াতে আরম্ভ করে। এমনকি যখন আমি তাদের কাছে পৌঁছি, অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর কাছে পৌঁছি তখন আমার ঘোড়া এমন হোঁচট খায় যে, আমি তার ওপর থেকে পড়ে যাই। আমি উঠে দাঁড়াই এবং নিজের তূণের দিকে হাত বাড়িয়ে তা থেকে তির নিই আর তা দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করি যে, তাদের ক্ষতি করতে পারবো কি-না, অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা করার বা বন্দি করার আমার যে উদ্দেশ্য রয়েছে, আমি তা পূর্ণ করতে পারবো কি-না। তিনি বলেন, ফলাফল তা-ই আসে যা আমি অপছন্দ করতাম অর্থাৎ এর ফলাফল আমার বিরুদ্ধে আসে যে, আমি তাদের বন্দি করতে পারবো না।

তিনি বলেন, আমি পুনরায় নিজের ঘোড়ায় চড়ি আর ফলাফলের বিরুদ্ধে কাজ করি বা যে ভাগ্য সামনে এসেছিল তার বিপরীত কাজ করি। ঘোড়া তড়িৎ গতিতে আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল আর আমি তাদের এতটা কাছে এসে যাই যে, আমি মহানবী (সা.) কে কুরআন পাঠ করতে শুনতে পাই। মহানবী (সা.) এদিক সেদিক দেখছিলেন না, কিন্তু হযরত আবু বকর বারংবার পিছন ফিরে দেখছিলেন। তখন আমার ঘোড়ার সামনের দুটি পা হাঁটু পর্যন্ত বালিতে গেঁথে যায়। অর্থাৎ কিছুক্ষণ পর যখন আমি নিকটে পৌঁছি তখন ঘোড়ার পাগুলো বালুতে গেঁথে যায় আর আমি পড়ে যাই। এরপর আমি আমার ঘোড়াকে ধমক দিই আর উঠে দাঁড়াই, কিন্তু সেটি তার পা মাটি থেকে বের করতে পারছিল না। অবশেষে সেটি যখন অনেক জোর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন তার উভয় পা থেকে ধূলো উড়ে বাতাসে ধোঁয়ার ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ পা এতটা গেঁথে ছিল যে, বের করতে গিয়ে জোর দেওয়ার কারণে এতটা পরিমাণ ধূলো উড়েছিল যে, মনে হচ্ছিল ধোঁয়া ছেয়ে গেছে। তিনি বলেন, তখন আমি দ্বিতীয় বার তির দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করলে সেই ফলাফলই বের হয় যা আমি অপছন্দ করতাম। অর্থাৎ আমি যা চাচ্ছিলাম অদৃষ্ট তার বিপরীত প্রকাশ পায়, অর্থাৎ আমি মহানবী (সা.) এর ওপর জয়যুক্ত হতে পারবো না। তখন আমি তাঁকে অর্থাৎ আমি মহানবী (সা.) কে ডেকে বলি যে, এখন আপনি নিরাপদ। তখন তিনি থেমে যান। অর্থাৎ এখন আর আমার কোন দুরভিসন্ধি নেই। তিনি বলেন, আমি আমার ঘোড়ায় চড়ে তাঁর (সা.) কাছে যাই। যখন তার বোধোদয় ঘটে তখন ঘোড়াও চলতে থাকে আর আমি মহানবী (সা.) এর কাছে পৌঁছে যায়। অথবা তারাও কিছুটা পিছনে আসেন বা থেমে যান। তিনি বলেন, তাদের কাছে পৌঁছনোর পথে যেসব প্রতিবন্ধকতার আমি সম্মুখীন হয়েছিলাম সেগুলো দেখে আমার হৃদয়ে এই ধারণা জন্মে যে, মহানবী (সা.) অবশ্যই বিজয়ী হবেন। আমি মহানবী (সা.) কে বলি যে, আপনার জাতি আপনার জন্য রক্তপণ নির্ধারণ করেছে। এরপর আমি তাদেরকে সেসব কিছু অবহিত করি যা মানুষ তাদের সাথে করার ইচ্ছা করেছিল। অর্থাৎ কাফেরদের যে মন্দ অভিপ্রায় ছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত তাদেরকে অবহিত করি। অতঃপর আমি তাদের সামনে আমার পাথেয় এবং জিনিসপত্র উপস্থাপন করি এবং বলি যে, এগুলো হলো আমার সাজসরঞ্জাম। তিনি সফরে যাচ্ছিলেন, তাই সফরের জন্য কিছু খাদ্যপানীয় সামগ্রি উপস্থাপন করি, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। মহানবী (সা.) অস্বীকার করে বলেন যে, না, আমাদের প্রয়োজন নেই। আর মহানবী (সা.) তাঁর সফরের কথা গোপন রাখার অনুরোধ করা ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই চান নি। অর্থাৎ কাউকে বলো না যে, আমরা কোন পথে যাচ্ছি। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.) এর কাছে নিবেদন করি যে, আপনি আমার জন্য একটি নিরাপত্তানামা লিখে দিন। মহানবী (সা.) আমের বিন ফুহায়রাকে বলেন, অর্থাৎ যিনি হাবশী দাস ছিলেন বরং এখন মুক্ত ছিলেন আর এখন মহানবী (সা.) এর সাথে সফর করছিলেন-তাকে বলেন যে, লিখে দাও। আর সে একটি চামড়ার টুকরোয় তা লিখে দেয়। এরপর মহানবী (সা.) যাত্রা করেন।

ইবনে শিহাব এর বর্ণনা রয়েছে যে, উরওয়া বিন যুবায়ের আমাকে বলেন যে, মহানবী (সা.) পথে হযরত যুবায়েরের সাথে মিলিত হন যিনি মুসলমানদের একটি কাফেলার সাথে সিরিয়া থেকে বাণিজ্য শেষে ফিরে আসছিলেন। হযরত যুবায়ের মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকরকে সাদা কাপড় পরিধান করান। মদীনায় মুসলমানরা জানতে পারে যে, মহানবী (সা.) মক্কা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাই তারা প্রতিদিন সকালে হাররা নামক ময়দানে যেতেন আর সেখানে তার (সা.) জন্য অপেক্ষা করতেন। এমনকি দুপুরের দাবদাহ তাদেরকে ফিরিয়ে দিত। অর্থাৎ দুপুর পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করতেন, আর সূর্য যখন মধ্য গগনে থাকতো তখন প্রচণ্ড গরমের কারণে তারা ফিরে যেতেন। তারা এই অপেক্ষায় ছিল যে, কখন মহানবী (সা.) মদীনায় পৌঁছবেন। তিনি বলেন,

ইমামের বাণী

" যে ব্যক্তি কান বিপদের সময় পদস্খলিত হবে সে খোদার কোন ক্ষতি করবে না, তার দুর্ভাগ্য তাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দিবে।"

(আল-ওসীয়্যত, পৃষ্ঠা: ১৯)

দোয়াপ্রার্থী: আযকারুল ইসলাম, জামাত আহমদীয়া
আমাইপুর, বীরভূম

একদিন দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর যখন তারা ফিরে আসে আর নিজেদের ঘরে পৌঁছয় তখন, এক ইহুদী ব্যক্তি কোনকিছু দেখার জন্য নিজ মহলের ছাদে চড়ে। তখন সে মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের দেখতে পায় যারা সাদা কাপড় পরিহিত ছিলেন আর তাদের ওপর থেকে মরীচিকা ধীরে ধীরে দূর হচ্ছিল। অর্থাৎ দূর থেকে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে চেহারা স্পষ্ট হতে থাকে। সেই ইহুদী তর সইতে না পেরে অবলীলায় উচ্চস্বরে বলে উঠে যে, হে আরবের লোকেরা! অর্থাৎ মদীনাবাসীদের সম্বোধন করে বলে যে, এই হলো তোমাদের সেই নেতা যার জন্য তোমরা অপেক্ষা করছ। সে জানতো যে, মুসলমানরা প্রতিদিন যায় আর এক জায়গায় অপেক্ষার জন্য একত্রিত হয়। এ কথা শুনতেই মুসলমানরা উঠে দ্রুত নিজেদের অস্ত্র নেয় আর হাররা ময়দানে মহানবী (সা.) কে স্বাগত জানায়। তিনি (সা.) তাদেরকে সাথে নিয়ে নিজের ডান দিকে ফিরেন আর বনি আমর বিন অউফ এর মহল্লায় তাদের সাথে নামেন। এটি ছিল সোমবার আর রবিউল আউয়াল মাস। হযরত আবু বকর মানুষের সাথে সাক্ষাতের জন্য দাঁড়ান আর মহানবী (সা.) নিশ্চুপ বসে থাকেন। তখন আনসারদের মাঝ থেকে যারা মহানবী (সা.) কে ইতিপূর্বে দেখে নি, তারা আসে আর হযরত আবু বকরকে সালাম জানাতে থাকে। এমনকি মহানবী (সা.) এর ওপর রোদ এসে পড়ে। অর্থাৎ অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে যায় এবং বেশ রোদ উঠে। সামান্য ছায়া ছিল যা দূরে সরে যায়। তখন হযরত আবু বকর আসেন এবং নিজের চাদর দিয়ে মহানবী (সা.) এর ওপর ছায়া করেন। তখন মানুষ মহানবী (সা.) কে চিনতে পারে। তিনি (সা.) বনু আমর বিন অউফ-এর মহল্লায় দশ রাতের কিছুটা অধিক সময় অবস্থান করেন আর সেই মসজিদ নির্মাণ করা হয় যার ভিত্তি রাখা হয় তাকওয়ার ওপর। মহানবী (সা.) তাতে নামায পড়েন।

এরপর তিনি (সা.) তার উষ্ট্রীতে আরোহন করেন আর মানুষ তাঁর সাথে পায়ে হাঁটতে থাকে। সেই উষ্ট্রী মদীনায় সেখানে গিয়ে বসে পড়ে যেখানে এখন মসজিদে নববী রয়েছে। সেই দিনগুলোতে সেখানে কয়েকজন মুসলমান নামায পড়তো, আর তা ছিল সোহেল এবং সাহাল এর খেজুর শুকানোর জায়গা। অর্থাৎ এটি এক উন্মুক্ত ময়দান ছিল যেখানে এই দুই এতীম ছেলে নিজেদের খেজুরের ফসল শুকাতো। এই ছেলে দুটি হযরত সাদ বিন যুরারা-র তত্ত্বাবধানে ছিল। তাঁর (সা.) উটনী যখন সেখানে বসে পড়ে তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ যদি চান এটিই আমাদের অবস্থানস্থল হবে। এরপর মহানবী (সা.) সেই উভয় বালককে ডেকে পাঠান এবং তাদের কাছে এই জমির মূল্য জানতে চান যেন এখানে মসজিদ বানাতে পারেন। তখন তারা উভয়ে বলে যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা আপনাকে এই জমি বিনামূল্যে দিতে চাই। মহানবী (সা.) তাদের কাছ থেকে এই জমি বিনামূল্যে নিতে অস্বীকার করেন এবং সেটি তাদের কাছ থেকে ক্রয় করেন। এরপর তিনি সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। মহানবী (সা.) এই মসজিদ নির্মাণের জন্য মানুষের সাথে ইট বহন করেন। তিনি (সা.) যখন ইট বহন করছিলেন তখন মুখে এই বাক্য উচ্চারণ করছিলেন-

'হাযাল হিমালু, লা হিমালা খায়বার, হাযা আবাররু, রাব্বানা ওয়া আতহার।'

অর্থাৎ এই বোঝা খায়বারের বোঝার ন্যায় নয়, বরং হে আমাদের প্রভু! এই বোঝা অনেক উত্তম এবং পবিত্র।

তিনি আরো বলতেন-

'আল্লাহুম্মা ইন্নাল আজরা আজরুল আখেরা ফারহামিল আনসারা ওয়াল মুহাজের।'

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আসল সওয়াব হলো পরকালের সওয়াব। তাই তুমি আনসার এবং মুহাজেরদের প্রতি সদয় হও। এটিও বুখারীর রেওয়ায়েত।

(সহী বুখারী, কিতাব মানাকেবুল আনসার, বাব হিজরাতুন্নাবী, হাদীস: ৩৯০৬)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হিজরতের এই ঘটনা সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন সেটিও আমি তুলে ধরছি। তিনি এটিকে নিজস্ব রীতিতে বর্ণনা করেছেন। তাই সেই বর্ণনাও কিছুটা আমি উল্লেখ করছি। তিনি (রা.) লিখেন-

"অবশেষে মক্কা মুসলমানশূন্য হয়ে পড়ে। মাত্র কয়েকজন ক্রীতদাস, স্বয়ং মহানবী (সা.), হযরত আবু বকর এবং হযরত আলী মক্কায় রয়ে যান। মক্কার লোকেরা যখন দেখলো যে, এখন শিকার আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে তখন সর্দাররা পুনরায় একত্রিত হয়ে পরামর্শ করল এবং এই সিদ্ধান্ত নিল যে, এখন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে হত্যা করা-ই সমীচীন হবে। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ তকদীরের অধীনে তাকে (সা.) হত্যা করার জন্য যে দিন নির্ধারিত হয় তা তাঁর (সা.) হিজরতের দিন ছিল। মক্কার লোকেরা যখন তাকে (সা.) হত্যা করার জন্য তাঁর ঘরের সামনে একত্রিত হচ্ছিল তখন তিনি রাতের অন্ধকারে হিজরতের অভিপ্রায়ে নিজ ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন। (এক দিকে কাফেররা একত্রিত হচ্ছিল আর অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশনা অনুযায়ী ঠিক সেই সময়েই তিনি (সা.) বের হচ্ছিলেন।) মক্কার লোকেদের অবশ্যই এই ধারণা ছিল যে, তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু তবুও যখন তিনি (সা.) তাদের সামনে দিয়ে যান তখন তারা এটিই ভাবে যে, এ ব্যক্তি অন্য কেউ। আর তাঁর (সা.) ওপর আক্রমণ করার পরিবর্তে তারা জড়সড় হয়ে তাঁর কাছ থেকে লুকাতে আরম্ভ করে। এই আশঙ্কায়, পাছে কেউ গিয়ে মহানবী (সা.) কে বলে দেয় যে, আমরা একত্রিত হচ্ছি।) যাতে মুহাম্মদ (সা.) তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে না পারেন তাই তারা জড়সড় হচ্ছিল। তিনি (রা.) লিখেন যে, সেই রাতের পূর্বের দিনই তাঁর (সা.) সাথে হিজরত করার জন্য আবু বকরকে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। অতএব তিনিও তাঁর সাথে মিলিত হন আর উভয়ে একত্রিত হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তারা মক্কা থেকে যাত্রা করেন এবং মক্কা থেকে তিন চার মাইল দূরে সওর নামক পাহাড়ের চূড়ায় এক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। মক্কার লোকেরা যখন জানতে পারে যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা ছেড়ে চলে গেছেন তখন তারা একটি সেনাদল একত্রিত করে আর তাঁর (সা.) পিছু ধাওয়া করে। তারা একজন পথনির্দেশককে সঙ্গে নেয়, যে তাঁর (সা.) সন্ধান করতে করতে সওর পাহাড়ে পৌঁছে যায়। সেই পাহাড়ের কাছে পৌঁছে, যেখানে তিনি (সা.) আবু বকরের সাথে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলে যে, হয় মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এই গুহায় রয়েছেন নতুবা আকাশে চলে গেছেন। তার এই কথা শুনে হযরত আবু বকরের মনোবল হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় আর তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বলেন যে, শত্রু মাথার ওপর পৌঁছে গেছে আর কয়েক মুহূর্তেই গুহায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে। তিনি (সা.) বলেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (সূরা তওবা: ৪১) অর্থাৎ হে আবু বকর! ভয় পেয়ো না, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সাথে আছেন। হযরত আবু বকর উত্তরে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি নিজ প্রাণের জন্য ভয় করি না, কেননা আমি তো এক সামান্য মানুষ। আমি মারা গেলে একজন মানুষই মারা যাবে। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার শুধু এই ভয় হচ্ছে যে, যদি আপনার প্রাণের ওপর কোন বিপদ আসে তাহলে পৃথিবী থেকে আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্মের নামচিহ্ন মুছে যাবে। তিনি (সা.) বলেন, কোন ভয় নেই। এখানে শুধু আমরা দুই জনই নই বরং তৃতীয় সত্তা খোদা তা'লাও আমাদের সাথে আছেন। যেহেতু এখন সেই সময় উপস্থিত যেন খোদা তা'লা ইসলামকে প্রসারিত করেন আর উন্নতি দান করেন, আর মক্কাবাসীদের অবকাশের যে সময় দেওয়া হয়েছিল তা শেষ হয়ে গিয়েছে, তাই খোদা তা'লা মক্কাবাসীদের চোখ পর্দাবৃত করে দেন আর তারা সেই খোঁজিকে নিয়ে হাসাহাসি করতে থাকে আর বলে যে, তিনি (সা.) কি এই উন্মুক্ত জায়গায় আশ্রয় নিবেন, এটি কোন আশ্রয় নেওয়ার স্থান নয়। তাছাড়া এখানে অনেক সাপ-বিছেও বসবাস করে। কোন বুদ্ধিমান এখানে আশ্রয় নিতে পারে না। আর গুহায় উঁকি দিয়ে দেখার পরিবর্তে তারা সেই খোঁজিকে নিয়ে ঠাট্টা করতে করতে ফিরে যায়।

দুই দিন সেই গুহায় অপেক্ষার পর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রাতের বেলা গুহার কাছে বাহন পৌঁছানো হয়। আর দুটি দ্রুত গতি সম্পন্ন উটনীতে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর সাথি যাত্রা করেন। একটি উটনীর ওপর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং পথ নির্দেশক চড়েন। আর দ্বিতীয় উটনীর ওপর হযরত আবু বকর এবং তাঁর ভৃত্য আমের বিন ফুহায়রা চড়েন। মদীনার দিকে যাত্রা করার পূর্বে মহানবী (সা.) মক্কার দিকে ফিরেন, সেই পবিত্র শহরের দিকে, যেখানে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন, যেখানে তিনি প্রেরিত হয়েছেন এবং যেখানে হযরত ইসমাঈল (আ.) এর যুগ থেকে তাঁর (সা.) পিতৃপুরুষগণ বাস করছেন, তিনি শেষবারের মত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন আর আক্ষেপের সাথে সেই শহরকে সম্বোধন করে বলেন, হে মক্কা নগরী! তুমি আমার কাছে সকল স্থানের চেয়ে বেশি প্রিয়, কিন্তু তোমার অধিবাসীরা আমাকে এখানে থাকতে দিচ্ছে না। তখন হযরত আবু বকরও অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বলেন, এরা নিজেদের নবীকে বহিষ্কার করেছে, এখন এরা অবশ্যই ধ্বংস হবে।

মক্কাবাসীরা তাঁর (সা.) সন্ধানে ব্যর্থ হওয়ার পর ঘোষণা দেয়, যে-ই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) অথবা আবু বকরকে জীবিত বা মৃত ফিরিয়ে আনবে তাকে একশত উটনী পুরস্কার দেওয়া হবে। আর এই ঘোষণার সংবাদ মক্কার আশেপাশের গোত্রগুলোতেও পাঠানো হয়। সুতরাং এক মরুবাসী নেতা সুরাকা বিন মালেক সেই পুরস্কারের লোভে তাঁর (সা.) পিছু ধাওয়া করে। সন্ধান

করতে করতে মদীনার পথে সে তাঁর (সা.) কাছে পৌঁছে যায়। যখন সে দুটি উটনী এবং তার আরোহীদের দেখতে পায় এবং বুঝতে পারে যে, এরাই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর সাথি, তখন সে তাদের পশ্চাদ্ধাবনে তার ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। কিন্তু পথে ঘোড়া প্রচণ্ড হোঁচট খেলে সুরাকা পড়ে যায়। সুরাকা পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিল। সে স্বয়ং নিজের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করে।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২২২-২২৪)

এরপর সেই বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে যা পূর্বে সুরাকার প্রেক্ষিতে বর্ণিত হয়েছে। এরপর হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন,

"যখন আমের বিন ফুহায়রা মহানবী (সা.) এর নির্দেশে নিরাপত্তাবার্তা লিখে সুরাকার হাতে দেন তখন সুরাকার ফেরার সময় সাথে সাথেই আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য থেকে সুরাকার ভবিষ্যতের অবস্থা মহানবী (সা.) এর কাছে প্রকাশ করেন। তিনি (সা.) সে অনুসারে তাকে বলেন যে, সুরাকা! তখন তোমার কী অবস্থা হবে যখন তোমার হাতে কিসরার কঙ্কণ শোভা পাবে? সুরাকা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে যে, ইরানের বাদশা কিসরা বিন হরমুযের কথা বলছেন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় ১৬/১৭ বছর পর আক্ষরিকভাবে পূর্ণতা লাভ করে।

সুরাকা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মদীনায় চলে আসে। মহানবী (সা.) এর ইন্তেকালের পর প্রথমে হযরত আবু বকর এবং এরপর হযরত ওমর খলীফা নিযুক্ত হন। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও বৈভব দেখে ইরানীরা মুসলমানদের ওপর হামলা করা আরম্ভ করে। ইসলামকে পিষ্ট করা তো দূরের কথা তারা নিজেরাই ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিষ্ট হয়। (ইরানীরা প্রথমে হামলা আরম্ভ করেছিল।) পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মুসলমানদের ঘোড়ার পদধ্বনিতে অস্থির হয়ে ওঠে। আর ইরানের ধনভাণ্ডার মুসলমানদের করতলগত হয়। ইরানীদের যেসব ধনসম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয় তাতে সেই কঙ্কণও ছিল যা ইরানের বাদশা কিসরার হাতে রীতি অনুসারে সিংহাসনে বসার সময় শোভা পেত। সুরাকা মুসলমান হওয়ার পর তার সেই ঘটনা, যার সম্মুখীন সে মহানবী (সা.) এর হিজরতের সময় হয়েছিল, অত্যন্ত গর্বের সাথে মুসলমানদেরকে শোনাতো। আর মুসলমানরা এই বিষয়ে অবহিত ছিল যে, মহানবী (সা.) তাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন যে, সুরাকা! তখন তোমার কী অবস্থা হবে যখন তোমার হাতে কিসরার কঙ্কণ শোভা পাবে? গনিমতের মাল এনে যখন হযরত ওমরের সামনে রাখা হয় আর তাতে তিনি কিসরার কঙ্কণ দেখতে পান তখন পুরো চিত্র হযরত ওমরের চোখের সামনে ভেসে উঠে। অর্থাৎ সেই দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের কথা, যখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-কে স্বদেশ ছেড়ে মদীনায় আসতে হয়েছিল। আর সুরাকা এবং অন্যান্য লোকদের একশটি উট পুরস্কারের আশায় তাকে (সা.) হত্যা করে বা জীবিত অবস্থায় বন্দী করে মক্কাবাসীদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পশ্চাদ্ধাবন করা, আর তখন সুরাকাকে তাঁর এই কথা বলা যে, সুরাকা! তোমার অবস্থা তখন কতই না ঈর্ষনীয় হবে যখন তোমার হাতে কিসরার কঙ্কণ থাকবে- এটি কত বড় একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল! কত স্পষ্ট অদৃশ্যের সংবাদ ছিল! হযরত ওমর যখন নিজের চোখের সামনে কিসরার কঙ্কণ দেখলেন তখন খোদার শক্তিমত্তা বা কুদরত তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। তিনি বললেন, সুরাকাকে ডাক। তাকে ডাকা হলো। হযরত ওমর তাকে কিসরার কঙ্কণ নিজ হাতে পরিধান করার নির্দেশ দেন। সুরাকা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূলের খলীফা! স্বর্ণ পরা তো মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। হযরত ওমর বলেন, হ্যাঁ ঠিক বলছ, পুরুষদের জন্য স্বর্ণ পরা নিষিদ্ধ, কিন্তু এই উপলক্ষ্যে নয়। এটি সেই উপলক্ষ্য নয় যখন এটি নিষিদ্ধ হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্(সা.) কে তোমার হাতে স্বর্ণ পরিহিত দেখিয়েছেন। হয় তুমি এই কঙ্কণ পরবে নয়তো আমি তোমাকে শাস্তি দিব। কেননা এখন এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে আর এর বাকি অংশ তোমাকে পূর্ণ করতে হবে। সুরাকার আপত্তি নিছক শরীয়তের শিক্ষার কারণে ছিল, নতুবা তিনি নিজেও রসূলুল্লাহ্(সা.) এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা দেখার বাসনা রাখতেন। সুরাকা সেই কঙ্কণ নিজ হাতে পরিধান করেন। আর এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী মুসলমানরা স্বচক্ষে পূর্ণ হতে দেখেছে।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২২৬)

কোন কোন গ্রন্থ অনুসারে সুরাকা বিন মালেককে কঙ্কণ পরানো সংক্রান্ত বাক্য তিনি (সা.) হিজরতের সময় বলেন নি, বরং যখন মহানবী (সা.) হুনায়েন ও তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন জিরানা নামক স্থানে বলেছেন। (বুখারী বি শারাহিল কিরমানী, ভাগ-১৪, পৃ: ১৭৮, কিতাব বাদউল খালক, হাদীস- ৩৩৮৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত)

কিন্তু অধিকাংশ বর্ণনায় একথারই উল্লেখ হয়েছে যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ হিজরতের সময় তিনি (সা.) এটি বলেছেন যেমনটি হযরত মুসলেহ্ মওউদও (রা.) লিখেছেন।

আমের বিন ফুহায়রা হিজরত করে মদীনায় আসার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। মহানবী (সা.) এর দোয়ায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন। হযরত আয়েশা বলেন মহানবী (সা.) হিজরতের পর যখন মদীনায় আসেন তখন তাঁর কয়েকজন সাহাবী অসুস্থ হয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর, হযরত আমের বিন ফুহায়রা আর হযরত বেলালও অসুস্থ হয়ে পড়েন। হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.) এর কাছে তাদেরকে দেখতে যাওয়ার অনুমতি চান। তিনি (সা.) তাকে অনুমতি প্রদান করেন। হযরত আয়েশা হযরত আবু বকরকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি কেমন আছেন? তখন উত্তরে তিনি এই পঙ্‌ক্তি পড়েন যে,

كُلُّ امْرِءٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

অর্থাৎ প্রতিদিন সকালে মানুষ যখন নিদ্রা থেকে জাগে, তখন তাকে সুপ্রভাত বলা হয়। অথচ মৃত্যু তার জুতোর ফিতের থেকেও নিকটতর হয়ে থাকে। অর্থাৎ সে যখন ঘুম থেকে উঠে তখন এই অবস্থা হয়ে থাকে। মোটকথা মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

এরপর তিনি হযরত আমের বিন ফুহায়রার কাছে কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি এই পঙ্‌ক্তি পড়েন যে,

إِنِّي وَجَدْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি মৃত্যুকে মৃত্যুর স্বাদ নেওয়ার পূর্বেই পেয়ে গেছি। আর নিশ্চয় ভীরুর মৃত্যু আকস্মিকভাবে আসে অর্থাৎ বাহাদুর বা সাহসী ব্যক্তি মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। আর ভীরুর কোন প্রস্তুতিই থাকে না। অর্থাৎ সে কোন প্রস্তুতি নেয় না। এরপর তিনি হযরত বেলালের কাছে তার খবরাখবর

জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি এই পঙ্‌ক্তি পড়েন যে,

يَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِفَجٍّ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَّ جَلِيلُ

অর্থাৎ আমি যদি জানতে পারতাম যে, মক্কার উপত্যকায় কোন রাত অতিবাহিত করব আর আমার চতুর্দিকে 'ইযখির এবং জলীল' (মক্কার ঘাস) থাকবে!

এরপর তিনি মহানবী (সা.) এর কাছে আসেন এবং তাঁকে সেসব সাহাবীদের কথা শোনান আর বলেন যে, আবু বকর এই কথা বলেছেন, আমের বিন ফুহায়রা এই কথা বলেছেন এবং বেলাল এই কথা বলেছেন। তখন মহানবী (সা.) আকাশের দিকে তাকিয়ে এই দোয়া করেন,

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَبَّبْتَ اِلَيْنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِهَا وَفِيْ مُدِّهَا وَانْقُلْ وَبَاءَهَا اِلَى مَهْيَعَةَ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! মদীনাকে সেভাবে আমাদের কাছে প্রিয় করে তোল যেভাবে তুমি মক্কাকে আমাদের জন্য প্রিয় করেছিলে বা তার চেয়েও বেশি। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য সা ও মুদ (পরিমাপের একক)-এ বরকত রেখে দাও। আর মদীনাকে আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত কর। আর এর মহামারিকে মায়েআ স্থানে স্থানান্তরিত কর, অর্থাৎ আমাদের কাছ থেকে এটিকে দূর করে দাও।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১০১-১০২, হাদীস- ২৫০৯২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৮)

হযরত আমের বিন ফুহায়রা বে'রে মঊনার ঘটনায় শাহাদত বরণ করেছিলেন। যখন তারা (কিছু মুসলমান) বে'রে মঊনার ঘটনায় নিহত হন আর হযরত আমর বিন উমাইয়া যামরীকে বন্দি করা হয় তখন আমের বিন তোফায়েল এক নিহত ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, এ কে? তখন আমের বিন উমাইয়া উত্তর দেন যে, তিনি আমের বিন ফুহায়রা। তখন আমের বিন তোফায়েল বলেন যে, আমি আমর বিন ফুহায়রাকে

দেখেছি যে, নিহত হওয়ার পর তাকে আকাশের দিকে উঠানো হয়েছে। এমনকি এখনো আমি দেখছি যে, আকাশ তার এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে। এরপর তাকে ভূমিতে নামানো হয়। মহানবী (সা.) এর কাছে তার সংবাদ পৌছয়। তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে তার নিহত হওয়ার সংবাদ দেন এবং বলেন যে, তোমাদের সাথি শহীদ হয়ে গেছেন। আর তিনি স্বীয় প্রভুর কাছে দোয়া করেছেন যে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের সম্পর্কে আমাদের ভাইদেরকে অবহিত কর যে, আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আর তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। অতএব আল্লাহ্ তা'লা তার সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়ায়ে রাজী, হাদীস- ৪০৯৩)

এটিও বুখারীরই বর্ণনা। এক অমুসলিমকেও আল্লাহ্ তা'লা এই দৃশ্য দেখিয়েছেন। যেভাবে মহানবী (সা.) কে আল্লাহ্ তা'লা এ সম্পর্কে জানিয়েছেন।

হযরত আমের বিন ফুহায়রাকে কে শহীদ করেছে- এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে তাকে আমের বিন তোফায়েল শহীদ করেছে, যে এ কথা বর্ণনা করেছে।

(আল ইসতিয়াব, ২য় খন্ড, পৃ: ৭৯৬)

আমের বিন তোফায়েলই প্রশ্ন করেছিল যে কে শহীদ করেছিল? সে তখন শত্রুদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু অপর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তাকে আব্দুল জব্বার বিন সালমী শহীদ করেছে। যাহোক বে'রে মঊনার সময় তিনি শহীদ হয়েছেন।

(আল ইসতিয়াব, ১ম খন্ড, পৃ: ২২৯)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত আমের বিন ফুহায়রার এই শাহাদতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন,

"অতএব দেখ! ইসলাম তরবারির জোরে বিজয় লাভ করে নি। বরং ইসলাম সেই মহান শিক্ষার মাধ্যমে জয়যুক্ত হয়েছে যা হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে এবং চরিত্রে এক উৎকৃষ্ট মানের পরিবর্তন সৃষ্টি করে। একজন সাহাবী বলেন যে, আমার মুসলমান হওয়ার একমাত্র কারণ এটি ছিল যে, আমি তাদের মেহমান ছিলাম যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলমানদের সত্তর জন ক্বারীকে শহীদ করেছিল। তারা যখন মুসলমানদের ওপর হামলা করে তখন তাদের মধ্যে কয়েকজন উঁচু টিলায় চড়ে যান আর কিছু তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবিচল থাকেন। শত্রুরা যেহেতু সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল আর মুসলমানরা ছিল খুবই স্বল্প, অধিকন্তু তারা ছিল নিরস্ত্র আর সাজসরঞ্জামহীন। এ কারণে তারা একে একে সব মুসলমানকে শহীদ করে। অবশেষে শুধু একজন সাহাবী অবশিষ্ট থাকেন যিনি মহানবী (সা.) এর হিজরতের সময় সাথে ছিলেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) এর মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন। তার নাম ছিল আমের বিন ফুহায়রা। অনেকে মিলে তাকে পাকড়াও করে এবং এক ব্যক্তি তার বক্ষে সজোরে বর্শা নিক্ষেপ করে। বর্শা লাগতেই তার মুখ থেকে অবলীলায় এই বাক্য বের হয়-**'ফুযতু ওয়া রাব্বিল কাবা'** অর্থাৎ কাবার প্রভুর কসম, আমি সফলকাম হয়েছি। যে ব্যক্তি পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং আক্রমণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে বলে, আমি তার মুখে এই বাক্য শুনে হতভম্ব হয়ে যাই। এক ব্যক্তি যে কিনা নিজের আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে, স্ত্রী-সন্তান থেকে দূরে, এত বড় বিপদের মুখে নিপতিত, তার বক্ষে বর্শা নিক্ষেপ করা হলে সে কিনা মৃত্যুর সময় কেবল একথাই বলেছে যে, 'কাবা শরীফের প্রভুর কসম, আমি সফলকাম হয়েছি।' এ ব্যক্তি পাগল নয় তো? এই কারণে আমি আরো কিছু লোকের কাছে জিজ্ঞেস করি যে, ব্যাপার কি? তার মুখ থেকে এমন বাক্য কেন বের হলো? সে উত্তর দিল, তুমি জান না, মুসলমানরা সত্যিই উন্মাদ। এরা যখন খোদার পথে মারা যায় তখন মনে করে যে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন আর তারা সাফল্য লাভ করেছে। তিনি বলেন যে, আমার মনমস্তিষ্কে এর এত গভীর প্রভাব পড়ে যে, আমি সিদ্ধান্ত নিই, আমি এদের কেন্দ্রে গিয়ে দেখব এবং নিজে এদের ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করব। এ উদ্দেশ্যে আমি মদীনায় পৌঁছি আর ইসলাম গ্রহণ করি। সাহাবীরা বলেন যে, এই ঘটনা অর্থাৎ এক ব্যক্তির বক্ষে বর্শা নিক্ষেপ করা হয় আর স্বদেশ থেকে সে শত শত মাইল দূরে, তার কোন প্রিয়জন বা আত্মীয়ও কাছে নেই, আর তার মুখ থেকে **'ফুযতু ওয়া রাব্বিল কাবা'** নিঃসৃত হয়-এটি যে ব্যক্তি পরে মুসলমান হয়েছিল তার হৃদয়ে এত গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে যে, সে যখন এই ঘটনা শোনাতো তখন **'ফুযতু ওয়া রাব্বিল কাবা'**-য় পৌঁছে এই ঘটনার প্রভাবে হঠাৎ তার শরীর কেঁপে উঠতো আর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন যে, ইসলাম স্বীয় অনুপম বৈশিষ্ট্যের কারণে বিস্তার লাভ করেছে, ক্ষমতার বলে নয়। "

(সেরে রূহানী, আনওয়ারুল উলুম,খণ্ড-২২, পৃ: ২৫০-২৫১)

এটিও বলা হয় যে, হযরত আমের বিন ফুহায়রার শাহাদতের সময় তার মুখ থেকে যে শব্দ বেরিয়েছে তাতে উভয় রেওয়ায়েত অর্থাৎ 'ফুযতু ওয়া রাব্বিল কাবা' আর 'ফুযতু ওয়াল্লাহ্' রয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এটিও উল্লেখ করেছেন যে, এই শব্দ অন্যান্য সাহাবীর মুখ থেকেও নিঃসৃত হয়েছে। আর এটি লিখতে গিয়ে তিনি বলেন যে, ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে, সাহাবীরা যুদ্ধে এমন অবস্থায় যেতেন যে, তারা মনে করতেন যুদ্ধে নিহত হওয়া তাদের জন্য একান্ত প্রশান্তি ও আনন্দের কারণ। যুদ্ধে কোন দুঃখ পেলে তারা সেটিকে দুঃখ মনে করতেন না বরং সুখ মনে করতেন। ইতিহাসে সাহাবীদের এমন অজস্র ঘটনা দেখা যায়। অর্থাৎ খোদার পথে নিহত হওয়াকেই তারা নিজেদের জন্য একান্ত প্রশান্তি জ্ঞান করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহানবী (সা.) এর সেসব হাফেযে কুরআন, যাদেরকে মধ্য-আরবের একটি গোত্রকে তবলীগ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল তাদের মাঝে হারাম বিন মিলহান ইসলামের বাণী নিয়ে আমর গোত্রের নেতা আমের বিন তোফায়েলের কাছে যান আর বাকি সাহাবীরা পিছনে অবস্থান করেন। প্রথম দিকে আমের বিন তোফায়েল এবং তার সাথিরা কপটাচার প্রদর্শন করে তার খাতিরযত্ন করে। কিন্তু তিনি যখন আশ্বস্ত হয়ে বসেন আর তবলীগ আরম্ভ করেন তখন তাদের কতক দুর্বৃত্ত এক পাপিষ্ঠর প্রতি ইঙ্গিত করে। আর ইশারা পেতেই সে হযরত হারাম বিন মিলহানের ওপর বর্শার আঘাত হানে যার ফলে তিনি ভূপাতিত হন। মাটিতে পড়ার সময় তার মুখ থেকে অবলীলায় এই বাক্য বের হয় যে, **'আল্লাহু আকবর ফুযতু ওয়া রাব্বিল কাবা'** অর্থাৎ কাবা শরীফের প্রভুর কসম, আমি মুক্তি পেয়ে গেছি। এরপর এইদুষ্কৃতকারীরা অন্যান্য সাহাবীদের পরিবেষ্টন করে তাদের ওপর হামলা করে। তখন হযরত আবু বকরের মুক্ত ক্রীতদাস আমের বিন ফুহায়রা, যিনি হিজরতের সফরে মহানবী (সা.) এর সফরসঙ্গী ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, তাঁর হত্যাকারী, যে পরে ইসলাম গ্রহণ করে, সে তার ইসলাম গ্রহণের কারণ এটিই উল্লেখ করত যে, আমি যখন আমের বিন ফুহায়রাকে শহীদ করি তখন তাঁর মুখ থেকে অবলীলায় 'ফুযতু ওয়াল্লাহে' নিঃসৃত হয়, অর্থাৎ খোদার কসম আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। অতএব এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, সাহাবীদের জন্য মৃত্যু দুঃখের পরিবর্তে খুশির কারণ হতো। "

(এক আয়াত কি পুর মারেফ তফসীর, আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড- ১৮, পৃ: ৬১২-৬১৩)

অতএব পরম সৌভাগ্যবান ছিল সেসব মানুষ, বিশেষ করে হযরত আমের বিন ফুহায়রা, যিনি হযরত আবু বকরের সেবা করারও সুযোগ পেয়েছেন, মহানবী (সা.)এরও সেবার সুযোগ পেয়েছেন আর তাঁর সাথে হিজরত করারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন, ইসলাম গ্রহণেরও সৌভাগ্য লাভ করেছেন, অধিকন্তু সওর পর্বতের গুহায় মহানবী (সা.) কে খাবার পৌছানোরও সৌভাগ্য হয়েছে। সে যুগে খাবার ছিল ছাগদুগ্ধ, অর্থাৎ তাকে ছাগলের দুধ পৌছানোর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল আর তিনি লাগাতার তিন দিন সেখানে ছাগল নিয়ে যানএবং ছাগলের দুধ সেখানে পৌছান। এছাড়া তার এই সুযোগও হয়েছে যে, তিনি সুরাকাকে নিরাপত্তানামাও লিখে দিয়েছেন, যা ছিল মহানবী (সা.) এর নির্দেশে। তার দোয়ার ফলে মহানবী (সা.) দূরে বসেই তার শাহাদতের সংবাদ লাভ করেন। তো এসব ব্যক্তি ছিলেন বিশ্বস্ততার মূর্ত-প্রতীক, যারা প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন। খোদা তা'লা তাদের পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন।

ইমামের বাণী

" পুণ্যের প্রতিটি পথ অবলম্বন কর। বলা যায় না, কোন পথে তোমরা তাঁর কাছে গৃহীত হবে।"

(আল ওসীয়্যত, পৃ: ২০)

দোয়াপ্রার্থী:

আব্দুর রহমান খান, জেনারেল ম্যানেজার (Lily Hotel) গৌহাটি

করেন- হে খোদা এই শহরের বাসিন্দা এবং আমার সন্তানের মধ্য থেকে এমন এক নবী আবির্ভুত কর যিনি এদেরকে তোমার আয়াত পাঠ করে শোনাবেন, তোমার কিতাব শেখাবেন, কেতাবের প্রজ্ঞা বর্ণনা করবেন এবং তাদের অন্তরকে পবিত্র করবেন। অর্থাৎ মক্কার যে ভিত্তি রাখা হয়েছিল তা আঁ হযরত (সা.)-এর আগমণের জন্য ছিল। আর এতে মহিলা ও পুরুষ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। হযরত হাজেরা যদি আল্লাহ্ তা'লার উপর আস্থা না রাখতেন এবং সন্তানের কুরবানীর জন্য প্রস্তুত না হতেন, তবে তিনি কখনো সেই মর্যাদা লাভ করতেন না যা আজ প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ে তাঁর জন্য রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়াও কুরআন করীমে হযরত মূসা (আ.)-এর মায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁকে আল্লাহ্ তা'লা এক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন, ফেরাউন যেহেতু তোমাদের শত্রু তাই সে তাকে হত্যা করার সংকল্প করবে। তাই তার জন্মের পর তাকে একটি ঝুড়িতে রেখে নদীতে ভাসিয়ে দিও। হযরত মূসার মায়ের খোদা তা'লা সত্তার প্রতি যে বিশ্বাস ও আস্থা ছিল সেই কারণে তিনি এমনটিই করেছিলেন। আর তিনি এবিষয়ে বিন্দু মাত্র পরোয়া করেন নি যে, এতে তার সন্তান ডুবেও যেতে পারে বা কোন জন্তুর শিকারে পরিণত হতে পারে, কেননা কেউ বলতে পারে না যে ঝুড়িটি জঙ্গলে কোথায় যাবে। এটি হয়তো ফেরাউনের হাত থেকে সন্তানকে রক্ষা করার কৌশল হতে পারত, কিন্তু নদীতে কোন সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সত্তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। এই কারণে সেই নির্দেশ অবিলম্বে শিরোধার্য করেছেন। কেবল একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে সন্তানকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার মত এমন দুঃসাহিক পদক্ষেপ হয়তো কোটি কোটি মহিলার মধ্যে কেউই করতে পারবে না। কিন্তু তিনি করেছিলেন। আর এর ফলেই মূসা রক্ষা পান।

হযরত মূসা (আ.) প্রসঙ্গেই আরও একজন মহিলারও কুরবানীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি ছিলেন ফেরাউনের স্ত্রী। তিনি নদীতে ভাসতে থাকা শিশুটির প্রতি কোনভাবে ফেরাউনকে অনুরত করে তাকে লালন পালনের জন্য গ্রহণ করে নেন। ফেরাউনের স্ত্রীও সব সময় এই দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি শিরকের অন্ধকার দূর কর এবং সত্যকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত কর। এখন দেখুন! সম্রাটের স্ত্রী, যিনি কি না জীবনের যাবতীয় সুখ ও স্বাচ্ছন্দ ভোগ করেন, আর ফেরাউনের মত সম্রাটের সঙ্গে থাকেন, যেফেরাউন কি না নিজেকে খোদার সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করাত, কিন্তু সহজাত পুণ্যের প্রণোদনা, নির্ভীকতা এবং আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক এমন পরিস্থিতিতেও সব কিছুকে উপেক্ষা করে তাঁর মনে এক-অদ্বিতীয় খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার উদগ্র বাসনার জন্ম দিয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'লাও এই কাজের প্রশংসা করেছেন এবং এমন এক মর্যাদা দান করেছেন যে এটিকে কুরআন করীমে উল্লেখ করেছেন। এই দুই মহিয়সী মহিলাও একটি ধর্মের ভিত্তি রাখতে ভূমিকা রেখেছেন।

এরপর হযরত ঈসা (আ.) -এর মাতাও অনেক ত্যাগস্বীকার করেছেন। নিজের সন্তানকে ক্রুশে ঝুলতে দেখেছেন। বুকে অনেক বল নিয়ে এই দৃশ্য তিনি দেখেছেন। অন্য কোন মা বা মহিলা হয়তো এই দৃশ্য কখনও দেখতে পারত না বা এমন ত্যাগস্বীকারের জন্য প্রস্তুত হত না। মোটকথা ধর্মের ইতিহাসে মহিলাদের বিশেষ স্থান ও মর্যাদা সংরক্ষিত আছে।

এরপর ধর্মের ইতিহাসে আমরা আরও দেখতে পাই যে, হযরত খাদীজা আঁ হযরত (সা.) -এর প্রথম ওহী থেকে, যখন তিনি নবুয়তের দাবী করেন এবং তাঁর বিরোধীতা আরম্ভ হয়, সেই সময় থেকে সুদীর্ঘ তেরো বছর পর্যন্ত নিদারুন দুঃখ কষ্টেও মহানবী (সা.)-এর সঙ্গ দিয়েছেন। একজন ধন্যাঢ্য মহিলা হয়েও তিনি কেবল নিজের যাবতীয় ধন-সম্পদ স্বামীর হাতে তুলেই ক্ষান্ত হন নি, বরং শোয়ব আবি তালাবে এক দুর্বিসহ পরিস্থিতিতে অনাহারে থেকে ত্যাগস্বীকার করে গেছেন। ত্যাগস্বীকারের এই ধারা আড়াই-তিন বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অনুরূপভাবে আরও অনেক মুসলমান মহিলারাও সেই সময় দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে, ইতিহাস যাদের কুরবানী বিস্মৃত হয় নি।

এছাড়া জ্ঞান ও মারেফের কথা উল্লেখ করা হলে মহিলাদেরকে অজ্ঞা বানিয়ে রাখা হয় নি বা কেবল পুরুষরাই জ্ঞান ও মারেফাত সম্পর্কে অবহিত এমনটি মনে করা হয় নি। ইসলামের ইতিহাস মহিলাদের জ্ঞান ও মারেফাতের কথাগুলি সংরক্ষিত করে রেখেছে। যেমন আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- কেউ যদি ধর্ম শিখতে চাও, তবে অর্ধেক ধর্ম আয়েশার কাছে শিখ। অর্থাৎ আমি তাকে এমনভাবে প্রশিক্ষন দিয়েছি এবং তার মধ্যে এমন যোগ্যতা তৈরী হয়েছে যে, ধর্মের খুঁটিনাটি বিষয়াদি এবং বিশেষ করে মহিলাদের বিষয়ে আয়েশার কাছে শিখ। আজ আমরা দেখতে পাই, মহিলাদের বিষয় সংক্রান্ত অনেক রেওয়াতে হযরত আয়েশা থেকে আমরা পেয়ে থাকি। আর পুরুষদের তরবীয়তও তিনি করেছেন। কুরআন করীমের প্রতি দৃষ্টি দিন, দেখুন সেখানে সর্বত্র খুঁটিনাটি বিষয়ের বর্ণনা, বিধিনিষেধ এবং পুরস্কারের কথা উল্লেখ করার সময় পুরুষ ও মহিলা উভয়ের উল্লেখ রয়েছে। যেখানে পুরুষদেরকে পুণ্যকর্মের আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে মহিলাদেরকেও পুণ্যকর্মের আদেশ দেওয়া হয়েছে। জান্নাতে যেমন পুরুষরা যাবে তেমন মহিলারা যাবে। পুরুষ উচ্চ মর্যাদা লাভ করলে মহিলারাও তা অর্জন করবে। যদি কোন পুণ্যবান ব্যক্তির পুণ্যের কারণে তার স্ত্রী অপেক্ষাকৃত কম পুণ্যবতী হওয়া সত্ত্বেও জান্নাতে যেতে পারে, তবে উৎকৃষ্ট মানের পুণ্যকর্ম সম্পাদনের ফলে নিম্নতর পুণ্যের অধিকারী তার স্বামীও নিজের স্ত্রীর কল্যাণে জান্নাতে যেতে পারে। জান্নাতে যদি পুরুষরা উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছায় নিজেদের পুণ্যকর্মের গুণে, তবে সেই উচ্চ মার্গে মহিলারাও উন্নীত হতে পারে। এও রেওয়ায়েত পাওয়া যায় যে, এক মহিলা রসুল করীম (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে যে, পুরুষরা আমাদের তুলনায় অধিক খোদার নৈকট্যভাজন। কেননা তারা জিহাদে অংশগ্রহণ করে, অথচ আমরা করতে পারি না। তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, ঠিক আছে, তোমরাও অংশগ্রহণ কর। তিনি অস্বীকার করেন নি। সে একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল, মুসলমানরা সেটিতে জয়লাভ করল। তখন সাহাবারা বললেন, সে যুদ্ধে সেভাবে অংশগ্রহণ করে নি, যেভাবে আমরা পুরুষরা যুদ্ধে লড়াই করে থাকি। অতএব তাকে 'মালে গনিমত' (যুদ্ধে জয়লাভের পর শত্রুদের পরিত্যক্ত সম্পদ) থেকে কোন অংশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আঁ হযরত (সা.) বললেন, না, তাকেও 'মালে গনিমত' থেকে অংশ দেওয়া হবে। এরপর প্রথা হয়ে দাঁড়ায় যে, পুরুষরা যুদ্ধে গেলে মহিলারাও ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়ার জন্য সঙ্গে যাবে। মোটকথা, মহিলারা বাইরে বেরিয়ে এসে জিহাদও করেছে এবং যাবতীয় বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও পুরুষদের সঙ্গে বিভিন্ন ছোটখাট দায়িত্ব পালনের জন্য জিহাদে অংশগ্রহণও করত। বরং রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় যে, যুদ্ধের কলা কৌশল আয়ত্ব করার জন্যও তারা প্রশিক্ষন নিয়েছে। তাদের চিন্তাধারা এই ছিল যে, খোদা তা'লার কারণে আমরা সকল প্রকার কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত থাকব। ধর্মকে তারা সর্বোপরি প্রাধান্য দিতেন। জাগতিক কামনা-বাসনা তাদের কাছে কোন মূল্য রাখত না।

অতএব আজ যদি আমরা এই দাবি করি যে, ইসলামী শিক্ষা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিতে হবে, তবে ব্যক্তিগত কামনা বাসনাকে উৎসর্গ করতে হবে। নিজেদের স্বামী ও সন্তানদের মধ্যে এই চেতনা জাগাতে হবে যে ধর্ম আগে আর খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের প্রাথমিকতা। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসুলের প্রতি ভালবাসা আমাদের প্রাথমিকতা। অন্যান্য ভালবাসার স্থান পরে।

হুযুর আনোয়ার বলেন- ইতিহাস কেবল প্রমূখ ও বড় বড় মানুষদের কথা সংরক্ষিত রাখে নি, বরং দরিদ্র, অসহায় মানুষদের কুরবানীকেও ইসলামের ইতিহাস সংরক্ষিত রেখেছে। যেমন-লুবিনা ছিলেন এক মহিলা সাহাবী। তিনি ছিলেন বনু আদি গোত্রের এক দাসী। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উমর তাঁকে এমন নির্মমভাবে প্রহার করতেন যে, তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় প্রহার করতে আরম্ভ করতেন। হযরত লুবিনা সামনে কেবল এতটুকুই বলতেন যে, উমর! তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ না কর, তবে খোদা তা'লা এই অত্যাচারের প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বেন না। তাই এটি ছিল খোদা তা'লার প্রতি তাঁর আস্থা। জুনিরা নামে আরও এক মহিলা ছিলেন, যিনি বনু মখসুম গোত্রের দাসী ছিলেন। আবু জাহাল তাঁকে এমন নির্মমভাবে প্রহার করে যে, মুখে প্রহার করে যে, তাঁর দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে যায়। (ক্রমশ:.....)

আল্লাহ্‌র বাণী

"এবং তোমরা যাহা কিছু গোপন কর এবং যাহা কিছু প্রকাশ কর, তাহা আল্লাহ্ জানেন।" (নহল: ২০)

দোয়াপ্রার্থী: বেগম আয়েশা খাতুন, জামাত আহমদীয়া হরহরি, মুর্শিদাবাদ

মহানবী (সা.)-এর হাদীস

মহানবী (সা.) বলেছেন- " আমি তোমাদেরকে প্রতিবেশীদের প্রতি উত্তম আচরণ করার উপদেশ দিচ্ছি।"

দোয়াপ্রার্থী: নুর আলাম, জেলা আমীর, জলপাইগুড়ি, (প:ব:)

১২৪তম কাদিয়ান সালানা জলসার রিপোর্ট।

আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভালবাসার মর্যাদা পর্যন্ত কেউ পৌঁছতে পারে না।
তাঁর প্রতিটি শব্দ আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসুলের প্রেমে বিলীনতার প্রমাণ।
এই শেষদিনগুলিকেও দরুদে পরিপূর্ণ করে দিন এবং নতুন বছরকেও দরুদ ও সালাম দিয়ে স্বাগত জানান, যাতে আমরা অতিশীঘ্র সেই সমস্ত কল্যাণরাজি অর্জনকারী হই যা আঁ হযরত (সা.)-এর সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে।

মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টার ন্যাশনাল-এর মাধ্যমে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ (আ.) কর্তৃক প্রদত্ত জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ।

আমি এই জনপদ অর্থাৎ কাদিয়ানে খোদা তা'লাকে দেখেছি। আমি ইসলামের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী নবী করীম (সা.)-এর প্রাণদাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর সত্তায় পূর্ণ হতে দেখেছি। পৃথিবীতে মাহদীর দাবিদার অনেক রয়েছে। তারা নিজেদের তবলীগ প্রসারের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন ব্যতিরেকে কারো একটি ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয় নি। আর তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি বেহিশতি মাকবারায় সমাহিত আছেন যাঁর ফলকে লেখা খোদিত আছে- 'মাযার মুবারক হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মওউদ ও মাহদী (আ.)। আমি আহমদীয়াতে বই পুস্তক অধ্যায়ন করেছি আর আহমদী মুসলমানদের সঙ্গে সাক্ষাত করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম। আহমদীরা অন্যান্য মুসলমানদের অপেক্ষা বেশি সত্যবাদী এবং উৎকৃষ্ট মুসলমান। আমি জানি না আরও কত শতাব্দী অতিক্রান্ত হবে, যেদিন সমগ্র বিশ্বের সব থেকে উচ্চ নারা ধ্বনি কাদিয়ান থেকে উত্থিত হবে। ইনশাআল্লাহ॥

কাদিয়ানের জলসা সালনায় অংশগ্রহণকারী নওমোবাঈনদের ঈমান উদ্দীপক বক্তব্য ও প্রতিক্রিয়া।

জামাত আহমদীয়া সারা বিশ্বে যে প্রেমের বাণী প্রসার করছে তা প্রশংসনীয়। আমি হুযুর আনোয়ারকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই, যিনি সারা বিশ্বে প্রেমের বাণী প্রসার করছেন। আপনাদের জামাতের খলীফা সারা বিশ্বে প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের বাণী প্রচার করছেন এবং বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

মুসলিম সমাজ চিরকাল শিখধর্মের অনুসারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল থেকেছে, তারা প্রত্যেক বিপদের সময়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এই দুটি ধর্মের বিশেষত্ব হল এরা এক-অদ্বিতীয় খোদার উপাসনা করে।

পৃথিবীতে খুব কম জলসা এমন হয়ে থাকে যেখানে মানবতার জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়। মানবতার সেবা সর্বাপেক্ষা মহান কাজ যা আপনার জামাত করছে। আজ যে উৎকৃষ্ট পন্থায় শান্তি ও ভালবাসার বাণী জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে তা প্রশংসনীয়।

জলসা সালানায় অংশগ্রহণকারী রাজনীতিবিদ ও ধর্মীয় নেতাদের মতামত।

৪৮ টি দেশ থেকে ১৮,৮৬৪ জন অতিথির জলসায় অংশগ্রহণ। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমাপনী ভাষণে লন্ডনে ৫, ৩৪৫ জন ব্যক্তি শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

**তাহাজ্জুদের নামায* কুরআনের দরস ও যিকরে ইলাহিতে পরিপূর্ণ পরিবেশ* উলেমাগণের জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য* সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন। * অতিথিদের মতামত ও প্রতিক্রিয়া* দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন ভাষায় জলসার অনুষ্ঠানাদির সরাসারি অনুবাদ সম্প্রচার। * জামাতের সদস্যদের জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তরবীয়তি তথ্যচিত্র এবং বিভিন্ন তথ্যসমৃদ্ধ প্রদর্শনীর আয়োজন। * নিকাহসমূহের ঘোষণা* প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় জলসার সংবাদ প্রচার।*

রিপোর্ট : মনসুর আহমদ মসরূর

(তৃতীয় পর্ব)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর রচনা কিশতিয়ে নূহ পুস্তকে বলেন-

' যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রী ও তার আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি উত্তম আচরণ করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নয়।'

অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন মৌলানা মুযাফফর আহমদ নাসের, নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযীয়া কাদিয়ান। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'পাঁচ ওয়াক্ত নামায, দোয়া, ইসতেগফার এবং যিকরে ইলাহির গুরুত্ব।' তিনি উপরি উক্ত চারটি বিষয়ের উপরে কুরআনী আয়াত, আহাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর বাণীর আলোকে বক্তব্য রাখেন। তিনি নামাযের বিষয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন। হুযুর বলেন-

' পূর্ববর্তীদের সঙ্গে মিলিত পশ্চাদবর্তীদের এই জামাতের সদস্যদেরও কর্তব্য..... যেরূপ সাহাবীরা নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করেছিলেন, আমরাও যেন নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করি, আর কেবল জাগতিকতার মধ্যেই যেন নিমগ্ন না থাকি। অঙ্গ সংগঠন এবং জামাতের ব্যবস্থাপনা এই রিপোর্ট দেয় যে, আমাদের নামাযীদের সংখ্যা ৪০, ৫০ কিম্বা ৬০ শতাংশে পৌঁছে গেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা একশ শতাংশ নামাযী তৈরী করতে পারব, আমাদের স্বস্তিতে বসে থাকা উচিত নয়। আর কেবল ব্যবস্থাপনাই নয়, বরং প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মাপর্যাচলোনা করা উচিত যে সে কোন অবস্থায় রয়েছে।'

[খুতবা জুমা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) প্রদত্ত, ১লা ডিসেম্বর, ২০১৭]

হুযুর আনোয়ার বলেন- 'যারা মসজিদের কাছাকাছি থাকেন, তারা নিজের নিজের মসজিদ বা নামায সেন্টারে নিয়মিত নামায পড়বেন এবং বিশেষ করে ফজরের নামাযে যাবেন। .... পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে মসজিদ নামাযীতে পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য চেষ্টা হওয়া উচিত। বিশেষ করে পদাধিকারীগণ , জামাতের কর্মী এবং ওয়াকফে জিন্দগীরা এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে নামাযের উপস্থিতি অনেক উন্নত হতে পারে।'

[খুতবা জুমা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) প্রদত্ত, ১৫ই এপ্রিল, ২০১৬]

দোয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি উপস্থাপিত হয়। হুযুর (আ.) বলেন-

' সেই দোয়া যা অন্তর্দৃষ্টি লাভের পর আশিসের মাধ্যমে উদ্ভুত হয় এর রং ও অবস্থাই ভিন্ন। সেটি বিলীনকারী বিষয়। এটা দাহিকাসম্বলিত এক অগ্নি, রহমতকে আকর্ষণকারী এক চুম্বকীয় আকর্ষণ। এটা এক মৃত্যু, কিন্তু অবশেষে এক জীবন দান করে। এটা এক প্রবল বন্যা কিন্তু অবশেষে নৌকা

তৈরী হয়ে যায়। সব বিশৃঙ্খল বিষয় এর মাধ্যমে সুবিন্যস্ত হয়। সব বিষ এক পর্যায়ে এতদ্বারা প্রতিষেধক হয়ে যায়।

সৌভাগ্যবান সেই বন্দী যিনি দোয়া করে ক্লান্ত হন না। কেননা তিনি একদিন মুক্তি পাবেনই। বরকতময় সেসব অন্ধ যারা আলস্য দেখান না। কেননা, একদিন দৃষ্টি লাভ করবেন। সৌভাগ্যবান তারা যারা কবরে পতিত অবস্থায় দোয়ার মাধ্যমে খোদার সাহায্য চান। কেননা, একদিন কবর থেকে বের হবেন।

কখনও যদি তোমরা দোয়ার ব্যাপারে ক্লান্তি না দেখাও; তোমাদের আত্মা যদি দোয়ার জন্য বিগলিত হয় ও তোমাদের চোখ অশ্রু বিসর্জন করে, তোমাদের বক্ষে এক প্রকারের আগুন লাগে, নির্জনতার স্বাদ উপভোগের জন্য তোমাদেরকে অন্ধকার ঘরে আর জন-মানবশূন্য জঙ্গলে নিয়ে যায়; তোমাদেরকে ব্যাকুল ও পাগল করে তোলে এবং তোমাদের মাঝে একটি গতি সৃষ্টি করে আর তোমাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দেয় তাহলে তোমরা সৌভাগ্যবান। কেননা পরিশেষে তোমাদের উপর আশিস বর্ষণ করা হবে। সেই খোদা যাঁর দিকে আমরা আহ্বান করি, তিনি একান্ত সম্মানিত, দয়ালু, লজ্জাশীল, সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও বিনয়ীদের প্রতি দয়ার্দ্র। সুতরাং তোমরাও বিশ্বস্ত হয়ে যাও। পুরো আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে দোয়া কর। ফলশ্রুতিতে তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। এ পৃথিবীর হট্টগোল থেকে পৃথক হয়ে যাও। কুপ্ররোচনার ঝগড়া দিয়ে ধর্মকে প্রভাবিত করো না। আল্লাহ্‌র জন্য হার মেনে নাও এবং পরাজয় স্বীকার কর। ফলশ্রুতিতে তোমরা বড় বড় সফলতার উত্তরাধিকারী হবে। খোদা দোয়াকারীদের নিদর্শন দেখাবেন এবং প্রার্থনাকারীদেরকে একটি অসাধারণ নেয়ামত দেওয়া হবে। খোদার পক্ষ থেকে দোয়া আসে আর খোদার দিকেই যায়। দোয়ার ফলে খোদা সেভাবে কাছে এসে যান যেমনটি মানুষের প্রাণ মানুষের কাছে। দোয়ার প্রথম পুরস্কারস্বরূপ মানুষের ভিতর পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। সেই পরিবর্তন অনুসারে খোদাও স্বীয় বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আনয়ন করেন। তাঁর গুণাবলী অপরিবর্তনীয়; কিন্তু পরিবর্তিত লোকদের জন্য তাঁর একটি ভিন্ন বিকাশ ঘটে যা পৃথিবী জানে না। তিনি যেন ভিন্ন খোদা অথচ তিনি ভিন্ন খোদা নন। কিন্তু নতুন জ্যোতির্বিকাশ তাঁকে নতুন রঙে প্রকাশ করে। তখন তিনি সে বিকাশের মহিমায় পরিবর্তিত ব্যক্তির জন্য সেই কাজ করেন যা অন্যদের জন্য করেন না। এটিই সেই অসাধারণ বিষয়।

মোটকথা দোয়া সেই মহৌষধ যা একমুষ্ঠি ধূলোকে স্বর্ণ বানিয়ে দেয় এবং এটা এক প্রকার পানি যা অভ্যন্তরীণ আবর্জনাকে ধুয়ে ফেলে। সেই দোয়ার মাধ্যমে রূহ বিগলিত হয় এবং পানির মত প্রবাহিত হয়ে আল্লাহ্‌র আস্তানায় পতিত হয়। ”

(লেকচার সিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২২২-২২৪)

ইসতেগফার সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য থেকে দুটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হচ্ছে। সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রহ.) বলেন-

“ সমগ্র বিশ্বে ইসলামের ধ্বজাকে সমুন্নত রাখা আমাদের জামাতের একান্ত দায়িত্ব। এই মহান দায়িত্ব পালন করতে হলে আমাদের নিজেদের যাবতীয় মানবীয় দুর্বলতা আল্লাহ্‌র তা’লার ক্ষমার চাদরে আবৃত থাকা আবশ্যক, সেগুলি যেন প্রকাশ না পায়। এই কর্তব্য পুরণ করার জন্য জামাতের প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলা, যাদের বয়স ৩৫ বছরের উর্দ্ধে, তাদের উচিত দিনে অন্ততপক্ষে একশ বার, যাদের বয়স ১৫ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে তাদেরকে তেত্রিশ বার, যাদের বয়স ৭ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে তাদেরকে ১১ বার , এবং অনুর্ধ ৭ বয়সী শিশুদের তিনবার ইসতেগফার পাঠ করা আবশ্যক। ”

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ২৮ শে জুন, ১৯৬৮, খুতবাতে নাসের, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০২)

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ খামিস (আই.) বলেন-

“ শয়তান যখন আক্রমণ করে, তখন সে মানুষকে প্ররোচিত করে, কুমন্ত্রণা দেয়, প্রকাশ্যে একথা বলে না যে, অবাধ্যতা কর বা অমুক অমুক পাপ কর, বরং পুণ্যের আবরণে পাপের দিকে পরিচালিত করে। অতএব শয়তানের ভালবাসাকে সত্য মনে করে সেটিকে জীবনের অঙ্গীভুত করবেন না, বরং সর্বদা ইসতফেগতারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা’লার আশ্রয়ে আসার জন্য প্রত্যেক আহমদীর চেষ্টা করা উচিত। শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার সব থেকে বড় আশ্রয় আল্লাহ্ স্বয়ং। অতএব এই অসৎ যুগে ইসতেগফারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা’লার আশ্রয়ে স্থান পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। কেননা ইসতেগফারের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে আসতে পারে।

(খুতবা জুমা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস, প্রদত্ত ২০ শে মে, ২০১৬, স্থান-মসজিদ নাসের গুটেনবার্গ, সুইডেন)

অধিবেশনের তৃতীয় বক্তব্য রাখেন মাননীয় সুলতান আহমদ জাফর সাহেব, নাযিম ইরশাদ ওয়াকফে জাদীদ কাদিয়ান। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল, ‘খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়ত অর্থাৎ প্রকৃত ঐশী ব্যবস্থাপনা এবং এর কল্যাণ।’ তিনি খিলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা’লা বলেন- খিলাফতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা’লা এই ধর্মকে স্থিতি ও দৃঢ়তা দান করবেন, যাকে তিনি মনোনীত করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ২০১৭ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত জামাতে আহমদীয়ার উপর বিশ্বব্যাপী যে ঐশী কৃপা ও অনুগ্রহরাজি বর্ষিত হয়েছে, তা সংক্ষেপে তুলে ধরেন।

* বিগত বছরে দুটি দেশ বৃদ্ধির সঙ্গে মোট ২১২ টি দেশে আহমদীয়াতের চারাবৃক্ষ রোপিত হয়েছে।

* এ যাবৎ ৭৫ টি ভাষায় সম্পূর্ণ কুরআন মজীদের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

* মিশন হাউসের সংখ্যায় ১৮০টি বৃদ্ধির সাথে বিশ্বব্যাপী মিশন হাউসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৮২৬।

* ৪১১ টি মসজিদ বৃদ্ধি পেয়ে গোটা বিশ্বে মসজিদের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭ হাজার ৪১১টি।

* আল্লাহ্‌র কৃপায় গোটা বিশ্বে ওয়াকফীনে নওদের সংখ্যা ৬৬ হাজার ৫২৫ অতিক্রম করেছে।

এই মূহুর্তে পৃথিবীতে ১২ টি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়ার পাঁচটি চ্যানেল দিবারাত্রি সম্প্রচার করছে। এছাড়াও ২১ টি রেডিও স্টেশন দিবারাত্রি সত্যের প্রচারের কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

* সমগ্র বিশ্বে মোট ৭১৪ টি স্কুল এবং ৩৭ টি হাসপাতালের মাধ্যমে জামাত আহমদীয়া দিনরাত মানবসেবার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ৪৯ টি দেশে হিউম্যানিটি ফার্স্টের মাধ্যমে ব্যাপকহারে মানবসেবার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

* প্রদর্শনী এবং বইমেলার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌছানো হয়েছে।

আজ জামাত আহমদীয়াই একমাত্র জামাত যারা ইসলামের সম্মান রক্ষার্থে বিশ্বব্যাপি যাবতীয় বাধাবিপত্তি ও বিপদাপদের মোকাবেলা করছে। কিছু দেশে এত প্রবল বিরোধীতা রয়েছে যে, প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের সঙ্গে তুলনা ছাড়া এর অন্য কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

আজ সমগ্র বিশ্বে ইসলামের নাম সমুন্নত রাখতে খিলাফতের ছত্রছায়ায় জামাত আহমদীয়ার সদস্যরাই নিজেদের সন্তানদেরকে ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছে। ইসলামের তবলীগের জন্য স্বদেশ ত্যাগ করে দেশান্তরে পাড়ি দিচ্ছে। কলেমার মহত্বের উদ্দেশ্যে প্রহৃত হচ্ছে, ইসলামের ভালবাসায় বন্দীদশাকে বরণ করে বছরের পর বছর অন্ধকার কক্ষে কাটিয়ে দিচ্ছে আর নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও তাদের অবিচলতায় বিন্দুমাত্র আঁচড় লাগে নি।

কাদিয়ানে অজ্ঞাত জনপদ থেকে উত্থিত কণ্ঠধ্বনি আজ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুখরিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা’লা সেই ধ্বনিকে এতটাই মহত্ব দান করেছেন যে, দূরদূরান্তের বিদ্বান ও পণ্ডিতকূল এর গুরুত্ব অনুধাবন করে সেটিকে মনোযোগ সহকারে শোনে এবং এর সত্যতাকে স্বীকার করে। বস্তুতঃ খিলাফতের ছত্রছায়ায় আহমদীয়া আন্দোলন এমন বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করে ফেলেছে যে, আজ পৃথিবীর এমন কোন অংশ নেই যেটিকে এর কল্যাণধারা স্পর্শ করে নি। আজ আমরা নির্ভীক চিত্তে বলতে পারি যে, সর্বক্ষণ ও সর্বত্র আহমদীয়াতের উপর আল্লাহ্ তা’লার সাহায্য ও সমর্থনের সূর্য উদ্ভাসিত রয়েছে আর ঐশী সাহায্যের ছত্রছায়ায় ইসলামের বিশ্বজয়ের প্রতিশ্রুত প্রভাত ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

এই বক্তব্যের সঙ্গে প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় দিন
প্রথম অধিবেশন।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনের অনুষ্ঠান মাননীয় সৈয়্যদ তানবীর আহমদ সাহেব, সদর আঞ্জুমান ওয়াকফে জাদীদ-এর সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। তিলাওয়াত করেন মাননীয় হাফিয আমান আলি সাহেব, মুয়াল্লিম সিলসিলা। তিনি সূরা তাকবীর -এর ১ থেকে ৩০ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করেন যার উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন মাননীয় মৌলবী জয়নুদ্দীন হামিদ সাহেব, নাযিম দারুল কাযা কাদিয়ান। এরপর বদর পত্রিকার সহ-সম্পাদক তনবীর আহমদ নাসের সাহেব সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -রচিত পবিত্র নযম পরিবেশন করেন।

‘দ্বীঁ কি নুসরাত কে লিয়ে এক আসমা পর শোর হ্যায়।’

এরপর সভার প্রথম বক্তব্য রাখেন মাননীয় হামীদ কওসর সাহেব, নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাল্লাহ। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল, ‘ হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) গৃহীত দোয়ার ঈমান উদ্দীপক

ঘটনাবলী।' তিনি হুযুর আনোয়ারের দোয়া গৃহীত হওয়ার কতিপয় ঘটনাবলী উপস্থাপন করেন, যেগুলির পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হল।

২০০৪ সালে হুযুর আনোয়ার (আই.) আফ্রিকা সফরে যখন নাইজেরিয়া থেকে বেনিন পৌঁছে মিশন হাউসে পদার্পণ করেন, তখন আসরের সময় হয়েছে। মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এসেছিল, নামাযের জন্য আঙিনায় যে তাবু খাটানো হয়েছিল সেটি চারিদিক থেকে উন্মুক্ত ছিল। তাই বৃষ্টির জন্য নামায পড়া অসম্ভব ছিল। এমনকি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকাও দুষ্কর ছিল। হুযুর বাইরে এসে নামাযের জন্য খোঁজ খবর নেন। আমীর সাহেব বলেন, এখন তো প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে, নামাযের জন্য বাইরে তাবু খাটানো হয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টির জন্য সেখানে নামায পড়তে সমস্যা হচ্ছে। হুযুর আনোয়ার আকাশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন- দশ মিনিট পর নামায পড়ব। এই কথা বলে হুযুর আনোয়ার ভিতরে প্রবেশ করেন। এর দুই-তিন মিনিট অতিবাহিত হতে না হতেই বৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে থেমে যায়। আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায় এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই রোদের দেখা মেলে। এরপর সেই তাবুর নীচেই নামাযের ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় লোকজন এমন নিদর্শন দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। তাদের দাবি, এখানে বৃষ্টি আরম্ভ হলে অবিরাম কয়েক ঘন্টা চলতে থাকে। হুযুর আনোয়ার দশ মিনিট বললেন, আর বৃষ্টি তিন মিনিটের মধ্যেই থেমে গেল। এমনকি আকাশও পরিস্কার হয়ে মেঘও উধাও হয়ে গেল।

২০০৮ সালে কিছু কারণবশতঃ কাদিয়ান জলসা সালানা নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয় নি। পরবর্তীতে ২০০৯ সালের ২৫,২৬ ও ২৭ মে তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। শেষের দিন হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমাপনী ভাষণ ছিল। পাঞ্জাবে মে মাসে ধুলোঝড় হয়ে থাকে। শেষ অধিবেশনের সময় প্রবল ধুলোঝড় আরম্ভ হয়। আবহাওয়া দপ্তরও প্রবল ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে রেখেছিল। জলসা গাহে আহমদী সদস্যরা ছাড়াও হিন্দু, শিখ ও খৃষ্টান ভাইয়েরাও হুযুর আনোয়ারে ভাষণ শোনার জন্য একত্রিত হয়েছিল। ঝড়ের তীব্রতা ক্রমে বেড়েই চলেছিল। মনে হচ্ছিল যেন জলসা গাহের সমস্ত কিছু লন্ডভন্ড করে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। সব থেকে বড় আশঙ্কা ছিল যে, বিদ্যুত ও এম.টি.এ বিভাগে ব্যাঘাত ঘটবে। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নিকট পরিস্থিতির খুঁটিনাটি বর্ণনা করে আবহাওয়ার উন্নতির জন্য দোয়ার আবেদন করা হয়। তিলাওয়াত ও নযমের পর হুযুর আনোয়ার তাঁর ভাষণ আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে বলেন- কাদিয়ান থেকে সংবাদ এসেছে যে, এখন সেখানে প্রবল ঝড় বইছে। দোয়া করুন জলসা যেন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়।" হুযুরের এই দোয়ার তিন মিনিটের মধ্যে ঝড় থেমে যায়। চরম গরম আবহাওয়াও মনোরম হয়ে ওঠে। আর শ্রোতারা আরামে বসে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ শুনলেন। আলহামদোলিল্লাহ আলা যালেক। নিজেদের ছাড়াও হিন্দু, শিখ এবং খৃষ্টান ভাইয়েরাও স্বীকার করেন যে এটি হুযুরের দোয়ার গ্রহণীয়তার একটি নিদর্শন।

অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন মাননীয় কে তারিক আহমদ সাহেব, সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার ভারত। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল- 'মানসম্মত চাঁদা এবং ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও কল্যাণ।' তিনি বক্তব্যের শুরুতে বলেন- ' মানুষের যখন ইহজগত থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আসে, তখন এই অনুভুতি তাকে অস্থির করে তোলে যে, জীবন যদি তাকে আরও কিছু সময় দিত আর সে আল্লাহ্ তা'লার পথে নিজের প্রিয় বস্তুকে নিঃসংকোচে খরচ করতে পারত! আর তার মনে এই বাসনা জাগে যে, 'যা কিছু আমার কাছে তার সমস্তই খোদার পথে ব্যয় করব এবং কোনওক্রমে খোদার সন্তুষ্টি লাভ করব।' এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, কেন সেই শেষ মূহুর্তে আল্লাহ্র পথে ব্যায় করার কথা মানুষের স্মরণে আসে? আর তার কাছে সহসাই কোন্ রহস্যই বা উন্মোচিত হয় যার দরুন তার বোধোদয় ঘটে যে, আল্লাহ্র পথে নিজের ধন-সম্পদ উৎসর্গ করাই হল তাঁর সন্তুষ্টি লাভের সর্বোৎকৃষ্ট ও উপযোগী উপায়। আঁ হযরত (সা.) মানুষের এই অবস্থার চিত্র এভাবে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে যে, হে আল্লাহ্র রসূল! কোন ধরণের সদকায় সব থেকে বেশি পুণ্য লাভ হয়? তিনি (সা.) বললেন- সুস্থ-সবল অবস্থায় কার্পণ্য সত্ত্বেও যে সদকা করা হয়। যখন একদিকে দারিদ্র তোমাকে শঙ্কিত করে, আর অপরদিকে বিত্তবান হওয়ার আকাঙ্খা থাকে। আর (এই সদকা খয়রাতে) কোন প্রকার শিথিলতা যেন না থাকে। এমন যেন না হয় যে, প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত, তখন তুমি বলবে এটুকু তার আর এটুকু অমুকের। অথচ তা (সেই সম্পদ) অমুকের হয়ে যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

(সহী বুখারী, কিতাবুয যাকাত)

অতএব সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে সুস্থ-সবল অবস্থায় আল্লাহ্র সঙ্গে নিজের হিসেব নিকেশ সম্পূর্ণ রাখে যাতে পরিণতি শুভ হয়, অন্যথায় কুরআন মজীদ যেরূপ রূপরেখা অঙ্কন করেছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় আর্থিক কুরবানীর চিন্তা করা অকৃতকার্যদের বৈশিষ্ট্য আর তা নিজেকে ধ্বংস করার কারণ।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

" এই যুগ কতই না কল্যাণমণ্ডিত, এখন কারো কাছে প্রাণের আহুতি চাওয়া হয় না। এটি প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার যুগ নয়, বরং সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী সম্পদ খরচ করার যুগ।

(আল হাকাম কাদিয়ান, ১০ই জুলাই, ১৯০৩)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) বলেন- আমার গোটা জীবনের অভিজ্ঞতা হল, যারা আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে ঋণশূন্য থাকে না আর তাকওয়াসহকারে নিজের সম্পদ থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর ধর্মের জন্য নির্ধারিত অংশ পৃথক করে দেয় না, তাদের অন্যান্য বিষয়ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ থাকে, তাদের সংসারের শান্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, ব্যবসা বানিজ্য ক্ষতির সম্মুখীন হতে থাকে, সন্তানের তরবীয়তে ব্যাঘাত ঘটে এবং সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবন কল্যাণশূন্য হয়ে পড়ে। "

(মালি নিযাম, ১ম ভাগ, পৃ: ৯৬)

ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) -এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন। হুযুর (রা.) বলেন-

" খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ ১৯০৫ সালে তাঁর পুস্তিকা 'আল ওসীয়্যত'-এর নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ভিত্তি রাখেন। ইসলামী রাষ্ট্রকে সবার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার সংস্থান করতে হলে অবশ্যই এরূপ রাষ্ট্রের হাতে ইসলামের প্রাথমিক যুগের তুলনায় অনেক বড় ধরণের সম্পদ থাকতে হবে। মসীহ মওউদ (আ.) এজন্য ঐশী নির্দেশে ঘোষণা করেন-

" খোদা তা'লা এরূপ নির্ধারণ করেছেন, যারা আজ প্রকৃত জান্নাত লাভ করতে উৎসুক তাদের নিজ সম্পদ ও অর্থের এক-দশমাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় কুরবানী করা আবশ্যক। তিনি আরও বলেছেন, এভাবে সংগৃহীত সম্পদ ইসলামের উন্নতি, কুরআনে শিক্ষা ও ধর্মীয় সাহিত্যের প্রচার ও ইসলামী প্রচারক তথা প্রচার কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ব্যয় করা হবে।"

সারকথা এই, নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ভিত্তি ১৯১০ সালে রাশিয়াতেও রচিত হয় নি বা অন্য কোন দেশে হয় নি। আর বর্তমান যুদ্ধের (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) শেষে বা ভবিষ্যতে এর ভিত্তি রচিত হবে না। প্রকৃতপক্ষে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা, যা প্রত্যেক মানুষের স্বস্তি ও সমৃদ্ধি আনা ও সত্য ধর্মকে রক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, এর ভিত্তিও ১৯০৫ সালেই রচিত হয়েছে। বিশ্ব আজ নতুন কোন বিশ্বব্যবস্থার মুখাপেক্ষী নয়।

(মালি নিযাম, পৃ: ৪০-৪১)

এটি আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আল্লাহ্ তা'লা কেবল নিজ কৃপাগুণে আমাদেরকে এমন আশিসমণ্ডিত ব্যবস্থাপনার অংশ হওয়ার সুযোগ দান করেছেন। আর আমরা যদি 'নাহনু আনসারুল্লাহ্' (আমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী) -এর মৌখিক দাবি করে এমন অসাধারণ ব্যবস্থাপনার অংশ না হই, তবে তা আমাদের জন্য চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হবে। ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপর কি পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর এই উদ্ধৃতি থেকে অনুমান করা যেতে পারে। তিনি বলেন-

" সারকতা এই, আল ওসীয়্যতের ব্যবস্থা এর নিজ সত্তায় ইসলারে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধারণ করে। যারা মনে করেন, আল-ওসীয়্যতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত তহবিল কেবলমাত্র ইসলামের আক্ষরিক অর্থে তবলীগের জন্যই ব্যবহার করা যাবে তারা ভ্রান্তিতে আছেন। এটি সঠিক নয়। আল-ওসীয়্যতের গন্ডীতে আক্ষরিক অর্থে তবলীগী প্রচেষ্ট এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এর পাশাপাশি সেই ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাও এর অংশ। এর অধীনে প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা মর্যাদাপূর্ণভাবে পূর্ণ করা হবে। যখন এ ব্যবস্থা পরিপক্কতায় পৌঁছবে তখন এটি কেবল তবলীগি কার্যক্রমেরই অর্থ সংস্থান করবে না, বরং প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণের মাধ্যমে অভাব-অনটন ও দুঃখদুর্দশাকে নির্মূল করতে ভূমিকা রাখবে। এতীমকে ভিক্ষা করতে হবে না। বিধবাকে

যুগ ইমামের বাণী

খোদাতালার অভিশাপ হইতে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিও কেননা তিনি অতি পবিত্র এবং আত্মমর্যাদাভিমানী।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ৩৩)

দোয়াপ্রার্থী: আনোয়ার আলি, জামাত আহমদীয়া, অভয়পুরী (আসাম)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 21 Feb, 2019 Issue No.8

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

দানের জন্য হাত পাততে হবে না। অভাবগ্রস্থকে উৎকণ্ঠায় দিনাতিপাত করতে হবে না। এ সমাজ ব্যবস্থা শিশুদের জন্য মাতৃতুল্য হবে। সব সমাজের জন্য পিতৃতুল্য হবে। আর নারীজাতিকে নিরাপত্তা প্রদান করবে। এ ব্যবস্থার অধীনে, বল প্রয়োগ বা বাধ্য হয়ে নয় বরং প্রকৃত ভালবাসা ও সহানুভুতি থেকে এক ভাই তার নিজ ভাইয়ের পাশে দাঁড়াতে উদগ্রীব থাকবে। আর এ কুরবানীও বৃথা যাবে না। প্রত্যেক দাতাকে খোদা তা'লা বহুগুণে তা পুষিয়ে দিবেন। ধনীরাও ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। গরীবরাও অপমানিত বোধ করবে না। এক জাতি অপর অপর জাতির বিরুদ্ধে লড়বে না। এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে না।

সুতরাং আপনাদের সকলের এ ব্যবস্থায় নিজ ওসীয়্যত করে ফেলা উচিত যেন নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা যথাসম্ভব শীঘ্র প্রকাশিত হয়। আর সেই শুভদিন যেন শীঘ্র আগমণ করে যেদিন সর্বত্র ইসলাম ও আহমদীয়াতের পতাকা উড্ডীন থাকতে দেখা যাবে। যারা ইতিমধ্যে ওসীয়্যত করেছেন তাদের আমি আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর যারা করেন ন তাদের জন্য দোয়া করছি যেন খোদা তা'লা এ সামর্থ্য তাদের দান করেন। যার ফলস্বরূপ তারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণে ভূষিত হন। ”

(ক্রমশ:.....)

রিপোর্ট: দুঃস্থ ছাত্রদের খাতা বিতরণ

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ও মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ইব্রাহিম পুরের যৌথ উদ্যোগে বিগত ৩০-০১-২০১৯ তারিখে ইব্রাহিমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছায় খাতা বিতরণ অনুষ্ঠিত হইল। আলহামদোলিল্লাহ॥

এই অনুষ্ঠানে জায়িম আনসারুল্লহ্ জনাব আমীর শেখ সাহেব সহ আনসারদের আমেলা কমিটি ও কায়েদ মজলিস জনাব কাফারুল শেখ সাহেব সহ খুদ্দামদের আমেলা কমিটি ও জেলা কায়েদ মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া মুর্শিদাবাদ জনাব মনিরুল শেখ সাহেব জেলা প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আবুল হায়াত সাহেবের অনুরোধে খাকসার ক্বারী শাফাতুল্লাহ্ মন্ডল মুয়াল্লিম সিলসিলা ইব্রাহিমপুর, সভাপতির আসন গ্রহণ করে।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি লইয়া ইব্রাহিমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আবুল হায়াত সাহেব বলিলেন যে আমার দীর্ঘ ২০ বছর চাকুরী জীবনে এই রকম মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করিতে কোন সংস্থা বা সহৃদয় ব্যক্তিকে দেখিনি। এটা আমার চাকুরী জীবনে বিশাল পাওনা, সরকার ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অনেক কিছুই করছে, কিন্তু কখনো কেউ দেখেছেন? গ্রামের কোন কমিটি শিশুদের নিয়ে এরকম ভেবেছে, আমি অন্তরের অন্তস্থল হইতে ইব্রাহিমপুর গ্রামের মসজিদ কমিটি ও বিশেষভাবে সম্মানীয় ইমাম সাহেব ক্বারা শাফাতুল্লাহ মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই এই সাধু উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য। আর যে মানুষটির কথা না বলিলে এই সভা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে তিনি হইলেন আমার আশরাফুল ভাই। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে উনাকে আমি সব সময় পাশে পাইয়াছি, উনি সৎ এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি।

আল্লাহ্ আমাদের সামান্যতম প্রচেষ্টা গ্রহণ করুন। আমীন।

সংবাদদাতা: ক্বারী শাফাতুল্লাহ্ মণ্ডল, মুয়াল্লিম সিলসিলা।

আল্লাহ্‌র বাণী

“এবং আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহবান করেন, এবং তিনি যাহাকে চাহেন সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন। ” (সূরা: ইউনুস, আয়াত : ২৬))

দোয়াপ্রার্থী: আব্দুস সালাম, জামাত আহমদীয়া নারার ভিটা (আসাম)

১ম পাতার শেষাংশ.....

পরিশোধ করা বা পুণ্যের প্রতিদানে পুণ্য করা। এই ফরযগুলি ছাড়া প্রত্যেক পুণ্যকর্মের নফল রয়েছে। অর্থাৎ এমন পুণ্যকর্ম যা আবশ্যিক কর্মের বাইরে অতিরিক্ত হিসেবে ধার্য করা হয়। যেমন- অনুগ্রহের প্রতিদানে অতিরিক্ত অনুগ্রহ করা। এই অতিরিক্ত কর্ম আবশ্যিক কর্মকে পূর্ণতা দান করে। এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার সচ্চরিত্রবান ব্যক্তিরা ধর্মীয় আবশ্যিক কর্মগুলিকে নফল বা ঐচ্ছিক ইবাদতের মাধ্যমে পূর্ণ করে থাকে। যেমন- যাকাত ছাড়া তারা অতিরিক্ত হিসেবে সদকাও দিয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা এমন মানুষের বন্ধু হন। তিনি বলেন, এই বন্ধুত্ব উন্নতি সাধন করে এমন নৈকট্য লাভ হয় যে, আমি তার হাত-পা এমনকি মুখ হয়ে যায় যারা দ্বারা এমন ব্যক্তি কথা বলে।

প্রত্যেকটি কর্ম খোদা তা'লা ইচ্ছানুসারে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বস্তুত মানুষ যখন স্বীয় প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও আত্মকেন্দ্রীকতা থেকে মুক্ত হয়ে খোদার ইচ্ছার অধীন পরিচালিত হয়, তখন তার আর কোন কর্মই অবৈধ থাকে না। বরং প্রত্যেকটি কর্মই খোদার ইচ্ছা অনুসারে হতে থাকে। মানুষ যেখানে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, সেখানে সবসময় দেখা যায় যে, সেই কাজ খোদার ইচ্ছানুসারে সম্পাদিত হয় না, বরং সেটি খোদার সন্তুষ্টির বিপরীতে হয়ে থাকে। এমন ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির দাসত্ব করে। যেমন- ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এমন কোন কাজ করে বসে যার ফলে বিষয় মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায়, বা ফৌজদারি অপরাধী হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু কেউ যদি মনঃস্থির করে যে, সে আল্লাহ্ তা'লার কেতাবের আদেশবলীর বিরুদ্ধাচারণ করবে না এবং সমস্ত বিষয়ে সেদিকেই প্রত্যাবর্তন করবে, তবে আল্লাহ্ তা'লার কেতাব অবশ্যই তাকে পথপ্রদর্শন করবে। যেরূপ তিনি ঘোষণা দিয়েছেন-

وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ

(সূরা আনআম, আয়াত: ৬০) অতএব আমরা যদি মনঃস্থির করি যে, সব সময় কিতাবুল্লাহ্ থেকেই পরামর্শ গ্রহণ করব, তবে অবশ্যই তা থেকে পথপ্রদর্শন লাভ হবে। কিন্তু যে নিজ প্রবৃত্তির দাস, সে সবসময় ক্ষতির মধ্যেই পড়বে। এক্ষেত্রে প্রায়ই তাকে মূল্য চোকাতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কিন্তু এর বিপরীতে ওলীউল্লাহরা সকল পরিস্থিতিতে তাঁর প্রতি অনুরত থাকবে। তারা যেন আল্লাহতে বিলীন হয়ে গেছে। অতএব, খোদার প্রতি এই আত্মবিলীনতা যার মধ্যে যত কম সে খোদা থেকে তত দূরে। কিন্তু খোদাতে তার আত্মবিলীনতা যদি তাঁর অভিপ্সীত মান অনুযায়ী হয়, তবে এমন ব্যক্তির ঈমানের অবস্থা অবর্ণনীয় রূপ ধারণ করে। তাঁদের সমর্থনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

مَنْ عَادٰلِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ

(হাদীস) যে ব্যক্তি আমার ওলী বা বন্ধুর সঙ্গে মোকাবেলা করে সে আমার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অতএব দেখ, মুত্তাকীর সম্মান ও মর্যাদা কত উঁচু। যখন কোন ব্যক্তি খোদার এমন নৈকট্যভাজন হয়ে ওঠে যে, তাকে যাতনা দেওয়া খোদাকে যাতনা দেওয়ার নামান্তর হয়, তখন এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কিরূপ অসাধারণ সাহায্য অবতীর্ণ হবে তা কল্পনার উর্দ্ধে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২-৩)

(ভাষান্তর: মির্যা সফিউল আলাম, মুবাল্লিগ সিলসিলা)

****

আল্লাহ্‌র বাণী

“তাহারা কোন মো'মেনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে না। বস্তুতঃ ইহারাই সীমালংঘনকারী। (তওবা: ১০)

দোয়াপ্রার্থী: গোলাম মুস্তফা, জেলা আমীর জামাত আহমদীয়া,মুর্শিদাবাদ

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.